বলবার মতন নয়

আশাপূর্ণা দেবী

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :

অরুণ পুরকায়স্থ

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং

৭৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

চিত্রশিল্পী :

প্রশান্ত গুপ্ত

মুদ্রাকর :

মন্মথ কুমার বসু

এভিনিউ প্রেস

১৬, সুরেন ঠাকুর রোড

কলিকাতা-১৯

*   *   *

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩৬১

মূল্য এক টাকা চার আনা
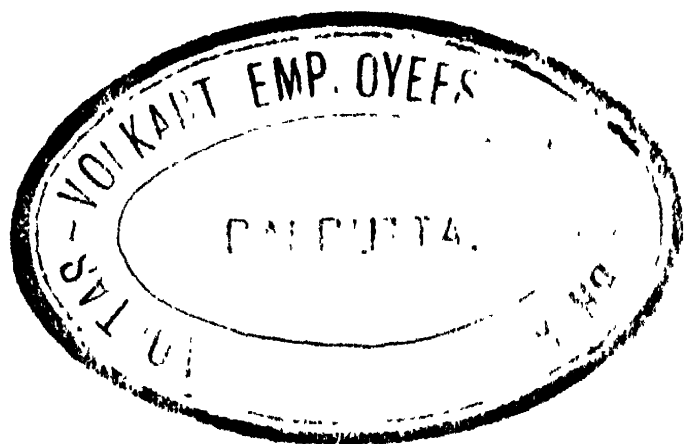
বাব্লুবাবুকে দিলাম।

—দিদিভাই

এতে আছে—

অথ পরেশ-ঘটিত

পরেশ আমার চাকর, কি আমিই পরেশের চাকর, সেটা সব সময় বুঝে ওঠা শক্ত। অচেনা লোক তো ভুল করবেই—আমারই ভুল হ'য়ে যায় মাঝে মাঝে। তুলনামূলক হিসেব করলে অপদস্থ হ'তে হবে আমাকেই।

গরমের দুপুরে আমি ঘেমে টেমে ভিজে থসথসিয়ে ছটফট করে বেড়াই, পরেশ ফর্সা ধুতির ওপর 'সামারকুল' গেঞ্জি চড়িয়ে স্বচ্ছন্দে বসে বসে বিড়ি খায়।...আবার শীতের দিনে আমি একটা মোটা

আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে জবুথবু গোছ হ'য়ে বসে থাকি, পারত-পক্ষে নড়ি না, ও লংক্লথের শার্টের ওপর রামধনু রঙা সোয়েটার পরে স্মার্টভাবে ঘুরে বেড়ায়।...বর্ষায় আমি মাথায় দিই ছাতা, ও গায়ে দেয় ওয়াটারপ্রুফ্।

আমি এখনো বাড়ীর সামনের রোয়াকে উবু হয়ে বসে পিঠে খবরের কাগজ ঢাকা দিয়ে দিশী নাপিতের কাছে চুল ছাঁটি, পরেশ সেলুন ছাড়া চুল ছাঁটার কথা ভাবতেই পারে না।

এসব খরচ—মিথ্যে বলব না—সবটাই যে আমাকে করতে হয় তা নয়—ও নিজেও কিছু খরচা করে।...মা যদিও বলেন—"তা'তে কি? বাজার দোকান থেকে দৈনিক যে আট দশ গণ্ডা পয়সা উপায় করে পরেশ, সে তো আমাদেরই পয়সা?"...কিন্তু আমার মতে—যে যেটা উপায় করে, সেটা তা'র নিজের সম্পত্তি,—'উপায়ে'র উপায়টা যাই হোক।

কাজেই পরেশের বাবুয়ানায় আমার আপত্তি করবার কিছুই নেই।

থাকা উচিতও নয়!

তাছাড়া থাকলেই বা শুনছে কে? চাকরগিরি করতে এসেছে ব'লে তো আর চাষা হ'তে পারে না পরেশ? চাষা হয়েই যদি থাকবে—কলকাতায় এসেছে কেন?

তবে কতকগুলো অভ্যাস—যেমন বেলা আটটা অবধি ঘুমোনো, বা আমার চিরুণীতে টেরিকাটা, আর আমার সাবান গায়ে মাখা প্রভৃতি বদ অভ্যাসগুলো সব সময় বরদাস্ত করা যায় না। রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যায়। তবুও ছাড়াতে পারি না।...এ বাজারে চাকর

একটী গেলে কি আর হবে? এ রকম চালাক চতুর চটপটে চাকর!···হাঁদারাম চাকর আমার দু'চক্ষের বিষ! বরং ফিচেল সহ্য হয়, তো উজবুক সহ্য হয় না।

ঘুম থেকে উঠে আমিই আগে সদর-টদর খুলি, গয়লা আর কাগজওয়ালার ডাকের জন্যে তৎপর হয়ে উঠি, তারপর উনুনে কেটলী চাপিয়ে পরেশকে ডাকাডাকি করি।...জল ফুটে ফুটে মরে যায়... পরেশ আর উঠতে চায় না। অনেক সাধ্য সাধনায়, অসন্তোষ অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রে অবশেষে হাই তুলে তুড়ি দিয়ে উঠে বসে।...ভারী গলায় বলে—চা টুকুন ভিজিয়ে দিন গে যান্ না বাবু! এমন কি মহামারী কাজ? যাচ্ছি—ঘুম থেকে উঠেই বুকের ভেতরটা কেমন ধড়ফড় করে, কাজে গা লাগে না।

অগত্যা চা আমি নিজেই তৈরী ক'রে নিই। সত্যি, একটা মানুষের বুক ধড়ফড় করলে তো আর হুকুম করতে পারি না?... আমি আবার একটু ইয়ে গোছের—যাকে বলে সাম্যবাদী।... তাই পরেশের চা-টাও তৈরী করে কাঁচের গেলাসে ঢেলে দিয়ে খবরের কাগজখানা নিয়ে বসি। তখন পরেশ এসে কাজে যোগ দেয়, মানে—মুখের সঙ্গে গেলাসের যোগাযোগ স্থাপন করে।

চায়ের পর ঝাঁটপাট দেওয়া, বিছানা তোলা, প্রভৃতি কাজ-গুলোই করার কথা—মা তাই বলেন, কিন্তু বাজার যাবার গরজ পরেশের ষোল ছাড়িয়ে আঠারো আনা। চা খাওয়া হ'লেই ফুলকাটা চটের থলিটী নিয়ে কেটে পড়ে। বেলা হয়ে গেলে না কি মাছ পাওয়া যায় না···

অবিশ্যি সকাল সকাল গেলেও পাওয়া যায় কি না আমার

জানা নেই। জানা সম্ভবও নয়,কারণ পরেশ যখন বাজার করে ফেরে, আমি তখন অফিসে পুরনো হয়ে গেছি।...মার মুখে শুনতে পাই, আমার খাওয়ার অসুবিধে নিয়ে মা বকাবকি করলে পরেশ উল্টে বিরক্ত হ'য়ে বলে—'বাবুর যেমন খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তাই সাড়ে আটটার সময় আফিসে গিয়ে বসে আছে, ওনার টাইমে পঞ্চব্যঞ্জন কে যোগাতে পারবে ঠাকুমা?"

আমিই বারণ করি মাকে—কি দরকার? আলুভাজা থাকলেই যথেষ্ঠ ভালো খাওয়া হয়।

রোজদিনের মতো আজও ঘুম ভেঙে নীচে নামছি—দেখি পরেশ ইতিমধ্যে উঠে বড় বড় দুটী কাঁচের গ্লাশে চা ঢালছে।... খুসী হয়ে উঠি, একগাল হেসে বলি—কি হে, পরেশবাবু যে আজ গুড্‌বয়! ব্যাপার কি?

পরেশ গম্ভীর ভাবে বলে—রাত্তিরে ভাইপোটা এসেছে বাবু, তার জন্যেই তাড়াতাড়ি। সে আবার এক পাগল ছাগল মানুষ, ঘুম থেকে উঠেই খেতে না পেলে রসাতল!...বিস্কুট দু'খানা দেন দেখি!

দু'খানা বিস্কুট দিতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু হঠাৎ পাগল ছাগল মানুষের আবির্ভাবের খবরে চমকে উঠি।

বললাম—সে আবার কে রে পরেশ? কই কখনো তো ভাইপোর কথা শুনিনি?

—গরীবের কথা কবে কান দিয়ে শুনেছেন বাবু? আছে সবই, ভূঁইফোঁড় তো আর নই!...পঞ্চু...অ পঞ্চু আয়রে—

কথার সুরে বাৎসল্য স্নেহ ঝরে পড়ে। পড়বে নাই বা কেন?

চাকর বলে কি মানুষ নয়?··· পরেশের ডাকে গুটিগুটি যে জীবটী এসে দাঁড়ালো, তাকে হঠাৎ দেখলে "পাগল ছাগল" ভাবা বিচিত্র নয়! বড় বড় চুল, মুখটা তেল চকচকে, হাত পা অপরিস্কার, পরণে সুধু একটি লুপ্তবর্ণ খাকী প্যাণ্ট—তাতে সাদা কাপড়ের তালি মারা। পেটের গড়ন দেখলে পীলের অবস্থান সম্বন্ধে নিশ্চয় হওয়া যায়।

নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে একটা কথা বলতে হয় তাই বলি—কি হে, কাজ কর্ম্ম করবে বলে এসেছ কলকাতায়?

পঞ্চু গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বিস্কুট চিবোতে থাকে।

—কাজ করবে না? তবে?

পঞ্চু বিরক্তভাবে বলে—কাজ করতে যাবো কি দুঃখে? ভুঁইয়ের ভাত কে খায় তার ঠিক নেই। মামাদের একশো বিঘে ধান জমির মালিক কে? এই পঞ্চুই তো! মামা তো শিঙে ফুঁকলো।

বুঝলাম পরেশের ভাইপো আর কিছুতে না হোক ভাষার ছটায় কাকার উপযুক্ত। ক'শো বিঘে জমিতে ওরা কথার চাষ করে কে জানে!

চায়ের গেলাসটা খালি করে নামিয়ে রেখে নিজের মনেই আবার বলে—এমনিই এসেছি কলকাতায়। বেড়াতে আসেনা মানুষ? কাকার বাসা রয়েছে যেখানে...

পঞ্চু রয়ে গেল।

আজও আছে কালও আছে।··· কিন্তু থাকবেনা কেন—নিজের কাকার বাসা রয়েছে যখন ?

মা থেকে থেকে এসে বলেন—হ্যাঁরে উদয়, পরশার ভাইপোটা রয়ে গেল এর মানে ? একে তো রেশনের চাল কমিয়ে দিয়েছে—তার ওপর ওই পাড়াগেঁয়ে দস্যি পোষা! একশো বিঘে জমির ধানের ভাত খাওয়ার ধাত ওদের, আমাদের এক মাসের চাল সাতদিনে কাবার করলে! তাড়া ওকে ?

—তুমিই তাড়াও না মা—কাতর ভাবে বলি।

—আমি ? রক্ষে করো বাবা। যা তোমার আদরের চাকরের লম্বা লম্বা কথা! সেদিন একটু বলেছি, আর পরশা বলে উঠলো—আপনার এমন ছোট নজর কেন ঠাকুমা ? কুকুর শেয়াল নয়, মানুষের ছেলে—দুটো ভাত খাচ্ছে—তাও প্রাণে সইছে না ? ওকি ভাতের অভাবে পড়ে আছে ? পাগল ছাগল উদোমাদা ছেলেটা মন টেঁকিয়ে আছে এই ঢের। কই বাবু তো কিছু বলে না ? আপনি বুড়োমানুষ ধম্ম কম্ম করুন—এদিকে দিষ্টি কেন ?

শুনে চক্ষুলজ্জা একটু না হ'য়ে পারে না।

সত্যিই বটে, মানুষের ছেলে দু'টো ভাত খাচ্ছে—তাও ঘরে যার ভাতের ছড়াছড়ি—তাকে বলি কোন লজ্জায় ?··· তবু রেশন সিষ্টেমের সুবিধে—চক্ষুলজ্জার বালাই কমে যায়।

সময় বুঝে একদিন বলি—হ্যাঁরে পরেশ, তোর ভাইপোর কলকাতা বেড়ানো হল ?

পরেশ বিরক্ত ভাবে হাত উল্টোয়—কই আবার ? সময় কোথা

পাচ্ছি বলুন ? চব্বিশ ঘণ্টাই তো আপনার কাজ। ওকে তো আর একলা ছেড়ে দিতে পারিনে ? শুধু চিড়িয়াখানা, যাতুঘর, হগমার্কেট, কোম্পানীর বাগান, হাবড়ার পুল, আর লেক্—এই দেখা হয়েছে—

খুসী হ'য়ে বলি—তবে তো সবই হয়েছে রে ? বাকী কি ? আর আছে কি কলকাতায় ?

—বাবুর এক কথা! কলকাতার জিনিস দেখে ফুরোয় ? লালদীঘি, গোলদীঘি, পরেশনাথের মন্দির, হাইকোর্ট, লাটসায়েবের বাড়ী—এসব বাদ দিলেও—সিনেমা ? এই তো মোটে সাতটা দেখা হয়েছে—সবগুলো দেখতে একবছরেও কুলোবে কি না সন্দেহ। নিত্যি নতুন বই উঠছে।

আমার আর বাক্যস্ফুর্ত্তি হয় না।

কলকাতার শহরের সমস্ত সিনেমাগুলো দেখে শেষ করতে হ'লে একজন্মেও কুলোবে কি না সন্দেহ হয়। মোটে সাতটা! কিছুই নয় তার কাছে।···সেই অনির্দ্দিষ্টকাল পঞ্চুর ভাত জোগাতে হবে!

মরিয়া হ'য়ে বলি—তোর ঠাকুমা যে বকাবকি করছিলেন—রেশন কমে গেছে...

—ঠাকুমার কথা বাদ দেন, যত বুড়ো হচ্ছে তত কেপ্পন হচ্ছে।

অবজ্ঞাভরে ঠোঁট উল্টে চলে যায় পরেশ।

আর কি বলবো ?

কিন্তু পারাও যায় না।

সহ্য করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

গরম হ'লেই পঞ্চু আমার ঘরে ঢুকে টেবিল ফ্যান খুলে দিয়ে

ঈজি চেয়ারে শুয়ে থাকে। খিদে পেলেই আমার মীট্‌সেফ্ থেকে মাখন বিস্কুট পাকাকলা আর কমলালেবুর সদ্ব্যবহার করে। আমার চটি পায়ে দিয়ে বেরিয়ে যায়, আর কলিকাতায় এসে সেলুনে ছাঁটা বাহারী চুলগুলি আমার 'মহাভৃঙ্গরাজে' চকচকে ক'রে রেখে দেয়। অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

ক্ষেপে গেলাম—

যেদিন দেখলাম আমার অনেক কষ্টে জোগাড়করা আটচল্লিশ ইঞ্চির ধোয়াসুতোর ফাইন ধুতিখানি পরে পঞ্চু থিয়েটার দেখতে গেছে।···রাগে গম গম করতে করতে সারাবাড়ী ঘুরে বেড়াই··· নাঃ খুড়ো ভাইপো দু'টোকেই আজ কোতোল করবো। ফাঁসি যেতে হয় তাও স্বীকার—খুনই করবো।···মাকে ডেকে বলি—মা, পঞ্চা আর পরশার চাল দিওনা আজ, দু'টোকেই দূর করে দেব।··· উঃ ইচ্ছে করছে কেটে ফেলি হতভাগা দু'টোকে।···ভালোমানুষীর কাল নেই।

খানিক পরে পান চিবোতে চিবোতে দুই মুর্ত্তিমানের উদয়।

মেজাজে শান দেওয়া ছিল—তেড়ে উঠে বললাম—পরশা! ষ্টুপিড হতভাগা রাস্কেল, দূর হ'য়ে যা। একখুনি দূর হ'য়ে যা। বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে, আর দ্বিতীয়বার যেন তোর মুখ দেখতে না হয় আমাকে।

পরেশ চিরদিনই গম্ভীর। গায়ের পাঞ্জাবী খুলে তারে মেলে দিতে দিতে গম্ভীর ভাবেই বল্লে—এখন রাতদুপুরে দুটো দুটো মানুষ কোথায় যাবো শুনি! আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলে আর 'দূর হয়ে যা বেরিয়ে যা' বলতে হ'ত না। যা জল আসছে

রাস্তায় তো মা গঙ্গা বইবেন। তবে যদি গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেন আলাদা কথা। ধৰ্ম্মে হয়, দিন।

আমি আর সহজে টলবো না ঠিক করেছি, হুঙ্কার দিয়ে বলি—তবে কি তুই ভেবেছিস বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবি?

পরেশ কিছু বলার আগেই পঞ্চু ফিক করে হেসে বলে—দাড়িই নেই দাদামশায়ের তা ওপড়াবে কি?

পরেশের সুবাদে আমি ওর দাদামশাই হয়ে গেলাম একেবারে! দেখ আস্‌পৰ্দ্ধা! সরাসর ওকেই ধমকাই—লক্ষ্মীছাড়া বদমায়েস! কিছু না বলে বলে সাহস বেড়ে গেছে! আমার ধুতি পরেছিস কেন?

পঞ্চু করুণভাবে বলে—আমার প্যাণ্টটা যে ছিঁড়ে গেছে।

—তাই ব'লে আমার কাপড় পরবি?

—ছেঁড়া প্যাণ্ট পরে থিয়েটার যাবো বুঝি? বা রে হিঁঃ।

—না যাবি তো ভেলভেটের সুট আনিস-নি কেন হনুমান?

—আনবো কি করে শুনি? মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে পালিয়ে এসেছি না?

—বেশ করেছ। এখন ভাল চাও তো মানে মানে সরে পড়ো।

পঞ্চু ম্লানমুখে চলে যায়। একটু যে মায়া না হ'ল তা'নয়—কিন্তু মরুক গে।

ও হরি! একটু পরেই নিজের ছেঁড়া প্যাণ্টটী পরে ছাড়া ধুতিখানি হাতে ক'রে পঞ্চুবাবু এসে হাজির।...এই নাও দাদামশায় তোমার কাপড়!···বাবা—একখানা কাপড়, খেয়েও ফেলিনি চুরিও করিনি, তার জন্যে এত মুখ নাড়া! শ্যাল কুকুরের মতন 'দূর হ

বেরো’ করে খেদিয়ে দেওয়া—ছিঃ। ভদ্দর নোকের ক্ষুরে দণ্ডবৎ।···

বিছানার ওপর কাপড়খানা রেখে চলে যায়।

মানুষ তো—তাই ‘বাষ্ট’ করি না, আস্তই দাঁড়িয়ে থাকি···কথা জোগায় না বলেই চুপ মেরে যাই।

পরেশ অমায়িক হেসে তাড়াতাড়ি কাপড়টা তুলে নিয়ে বলে—সাধে বলি উদোমাদা পাগল ছাগল। আক্কেলের ছিরি দেখ। ...বাবু তোর ছাড়া কাপড়খানা ফেরৎ নেবেন?...নে চল্। কাপড় কাপড় করে মরছিলি...ভালো কথা—গণ্ডা কতক পয়সা দেন দিকি, ঠাকুমা আবার আজ চাল নেয় নি. আমাদের। দু’টো দু’টো মানুষ রাত উপোসী থেকে গেরস্থর পাপ বাড়াতে পারি না তো! চট করে দেন, দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।

দাঁত কিড়মিড় করে পাগলের মত একটা টাকা ছুঁড়ে দিই।

—আস্ত টাকাটাই দিলেন? বেশী খরচা করা এক রোগ আপনার।···নে পঞ্চু, হিঙের কচুরী আর আলুর দম খাবো খাবো করছিলি—চল্।

পরদিন আবার ভাতের চাল নিতে হয়। উপায় কি? রোজ রোজ বাজারের খাবার খেলে পয়সা কি কম লাগবে?

সহ্যের সীমা অতিক্রম করলাম বই বিক্রীর ঘটনায়!

ক’দিন থেকেই দেখছি—যে বইটাই খুঁজি, পাই না। আল-

মাঝির তাক হালকা লাগে—সেল্‌ফ্‌ টেবিল ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে—কেন রে বাবা, পঞ্চু কি বইও পড়ে? ইংরাজী বই!

সেদিন থেকে পরশার সঙ্গে কথা কইনা, আজ বাধ্য হয়ে ডাকতে হ'ল।…কিন্তু কি শুনলাম?…পুরনো কাগজ বিক্রী হয় দেখে সখ ক'রে বইগুলো নাকি শিশি-বোতলওয়ালাকে বেচে দেওয়া হয়েছে। পাগল ছাগল মানুষ, কোন বইয়ের কি দর জানে না তো!

রাগারাগি করবার স্পৃহাও চলে যায়।

স্থির হয়ে বলি—কাল সকালে তোমাদের যেন আর দেখতে না পাই, অনেক সহ্য করেছি আর নয়।

পরেশ ক্ষুব্ধভাবে বলে—মানছি আপনার ক্ষেতি হয়েছে—কিন্তু বাবু সহ্য আমিই কি কম করেছি? বাপ মরা ভাইপোটা দু'দিন এসেছিল—ঠাকুমার কি খিটখিটুনী, দু'টো ভাতের জন্যে রাতদিন গজ গজ। ছেলেমানুষ অবুঝ—একটা অপরাধ করে ফেললে আপনার এ্যইসা রাগ!…দূর হোক ছাই, গরীবের আবার আপনার লোক, তার আবার মায়া! যাক গে—ও আপদকে বিদেয় করেই দিচ্ছি। কাল সকালে উঠে যদি ওর মুখ দেখতে পান, আমার নামে কুকুর পুষবেন।

সকালে উঠে হঠাৎ মার তীব্র চীৎকারে চমকে উঠি।…কান্না, না গালাগাল? না কি হাত-পা আছড়ানি?…কি হল? সাপে কামড়ালো?…উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যাই…হাঁফাতে হাঁফাতে বলি—মা, কি হ'ল তোমার?

মা কপালে থাবড়া মেরে আলমারীর দিকে দেখিয়ে দেন। কপাট খোলা, দেরাজ খোলা, মার গহনার বাক্সটী লোপাট। বুঝতে দেরী হয় না—পঞ্চুর কাজ।...মুখ দেখাবে না বলেই বোধ করি চিরদিন যাতে মুখটা মনে থাকে তার ব্যবস্থা করে গেছে।......

মা আমাকে দেখেই প্রবল চীৎকার করে ওঠেন—তোর আদরের চাকর আর পঞ্চা হতভাগাকে যদি ফাঁসি না দিাব উদয়, তো ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।...নয় তো দে আমাকেই এক খানা বঁটী কাটারী এনে দে, দু'টোকে আমিই কেটে ফাঁসি যাই।...

—তার দরকার কি ঠাকুমা?—পরেশ পাশ থেকে উদাসভাবে বলে—আমাকেই দাও অস্তরখানা—সে ছোঁড়াকে খুঁজে এনে কেটে কুচি কুচি করে নিজের গলায় চোপ্‌ দিই। মনের বাসনা মিটুক তোমার।... বলছি জিনিষ তোমার চুরি যায় নি—পাগল মনিষ্যি মনের ভুলে নিয়ে গেছে...তবু এমন চণ্ডাল রাগ যে দুহ'টো খুনই করতে রাজী!...চুড়ি, বালা, হার, অনন্তর শোকে ক্ষেপেই উঠলে একেবারে!...তা'ও বলি—বিধবা মানুষ, গয়নায় তোমার দরকারটা কি তাই শুনি?

নিবারণ উকিল হরকালীবাবুর পুরনো বন্ধু।

কেউ কারুর পরামর্শ ভিন্ন সহজে কিছু করেন না। নিবারণ নামকরা উকিল, আর যুদ্ধের বাজারে হরকালী দস্তুরমতো ফেঁপে উঠেছেন। অতএব কারুরই অপরের কাছে টাকা ধার করতে হয় না, কাজেই বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটবারও কোনো কারণ ঘটে নি।

সকালবেলা ডাক পড়তেই নিবারণ এসে হাজির, রাস্তা থেকেই হাঁক পাড়তে পাড়তে আসেন—কি ভায়া, কি খবর? সক্কালবেলা জরুরী তলব কেন?

আষাঢের অমাবস্যার মতো মুখ নিয়ে হরকালী বললেন—আমি উইল করবো।

নিবারণ তো আকাশ থেকে ডিগবাজী খেলেন।

—উইল করবে কি রকম? খামোকা উইল করবে মানে কি? কি উইল?

—একসঙ্গে ছুটো চারটে প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা সকলের থাকে না নিবারণ, একে একে বলো।

—একে একেই তো বলছি—বলি হঠাৎ রাত পুইয়েই উইল করবার কুমতলব কেন?

—সু-ই বল আর কু-ই বল, মন আমি স্থির করেছি নিবারণ! আমার বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত রামকৃষ্ণ মিশনে দান করে কাশীবাসী হবো।

—বিষয় আশয় মিশনে দেবে মানে? তোমার ছেলেরা?

—সব ব্যাটাকে তেজ্যপুত্তুর করবো, বুঝলে নিবারণ, একধার থেকে সব ক'টাকে।

—বল কি? হঠাৎ?

—তা বলতে পারো, কিন্তু ঠিক হঠাৎ বলা চলে না—আমি অনেক সহ্য করেছি বুঝলে, কিন্তু আর না। তুমি বন্ধু মানুষ, তোমায় বলতে বাধা কি—ছেলে তিনটী আমার এক একটী ধনুর্দ্ধর, বুঝলে? যেমনি পাজী তেমনি গোঁয়ার, উড়নচণ্ডে আর বেয়াদবের একশেষ। একফোঁটা মানে না আমাকে—একফোঁটা না। বলে কি না, 'দেশের কাজ করবে।' শুনেছ কথা নিবারণ? দেশের কাজ করতে যাবি কি দুঃখে তাই বল? সে করুক যাদের

ঘরে ভাত নেই তারা। তোদের মনে কর পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খেয়ে জীবন কেটে যাবে—তোদের এ উঞ্ছবৃত্তি কেন ?…'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী'—সেই ছোটলোকের মতন হৈ-হৈ করে বেড়াচ্ছে—আবার.বলে কি না—আমি সেকেলে—আমি বুড়ো ! এ্যাঃ নিজের বাপকে বলে কি না সেকেলে বুড়ো !!

নিবারণ হাসি চেপে বলেন—এ্যাঃ কী ভীষণ বেয়াদপি—নিজের বাপকে বলে বুড়ো ? তা এ ছেলেদের শিক্ষার দরকার, উইলই করা হোক, কি বল ?

—নিশ্চয়ই—এখুনি ! এই নাও কাগজ কলম, খসড়াটা হয়ে যাক।

—হয়ে যাক

নিবারণ লিখতে সুরু করেন—হরকালী বলে যান।

হরকালীর তিন ছেলের যাবতীয় দোষ বর্ণনা করে অবশেষে লেখা হ'ল—"যেহেতু তাঁর ছেলেরা এরূপ অবাধ্য দুর্বিনীত লক্ষ্মীছাড়া, সেহেতু হরকালী তাঁর নগদ ত্রিশ হাজার টাকা রামকৃষ্ণ মিশনে দান করতে ইচ্ছুক। বাড়ীখানিও বিক্রয় করা হবে, সে টাকা হরকালীর নিজের ভবিষ্যতের জন্য থাকবে—কারণ কাশীবাস করলেই তো আর বাবা বিশ্বনাথ দু'বেলা ভাত জোগাবেন না !

নিজের সম্পূর্ণ ইচ্ছায় সজ্ঞানে সুস্থশরীরে তিন ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করলেন হরকালী।"

নিবারণ লিখেটিখে কলমটী নামিয়ে বলেন—একেবারে তেজ্য-পুত্তুরই করে ফেললে হরকালী ? একটু দয়া-ধম্ম—

হরকালী তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন—দয়াধম্ম ? দয়াধম্ম

কি হে? ওদের দেখে নেবো না আমি? কত ধানে কত চাল দেখিয়ে ছাড়বো না? বাপকে মানবে না—বাপ বুড়ো! এখন বোঝো সুখ! তেজ্যপুত্তুর করবো না? আলবাৎ করবো, একশো বার করবো। কালই ঘাড় ধরে বার করে দেবো বাড়ী থেকে সব ক'টাকে।···বলি আমাকে তোদের দরকার, না তোদের নিয়ে আমার দরকার? আমার কি? একটা সুটকেস হাতে করে কাশী চলে যাবো, ব্যস্। টাকা দেবো, পেসাদ খাবো—কার কি তক্কা রাখি?

—কাশী যাওয়াই ঠিক করলে তা'হলে?

—'তা'হলে' মানে? এখনো আবার তা'হলে কি? এই উইল আজই রেজেষ্টারী করবার দরখাস্ত দাও গে যাও—একদিনও বিলম্ব নয়, কাশী যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি আমি। বাড়ীতে আমার এক দণ্ড সুখ নেই, বুঝলে? আঃ ঝাড়া হাত পায়ে কাশীবাসী হবো—এর চেয়ে আর সুখ কি আছে? একটী সুটকেস, একখানি রেলওয়ে টিকিট, আর আমি—ব্যস্।

—তা' যা বলেছ হরকালী।...তা'হলে মন তুমি স্থির করে ফেলেছ?

—কি বারে বারে সন্দেহ করছো? হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ। হ'ল?

—না না, তাই বলছি, রাগ কোরো না। আচ্ছা দেখি এটার ব্যবস্থা।

নিবারণ উঠে দাঁড়ান, উইলের খসড়াটা গুটিয়ে পকেটে পুরে একটী হাই তুলে একটু ইতস্ততঃ করে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে ওঠেন—তোমার এই গড়গড়াটা একেবারে রূপোর—না হরকালী?

—তাতে আর সন্দেহ আছে ?—হরকালী গর্ব্বিতভাবে বলেন—খাঁটি রূপো দিয়ে গড়ানো, আড়াই সের ওজন জিনিসটার। আজকালকার বাজারে ওর দাম...

—হ্যাঁ দাম অনেক, কিন্তু এটা তো তুমি আমায় প্রেজেণ্ট করতে পারো ?

—প্রেজেণ্ট ? হতবুদ্ধি হরকালী অবাক সুরে বলেন—প্রেজেণ্ট মানে ? হঠাৎ কি হ'ল তোমার ? বিয়ে না জন্মতিথি ?

—সে সব কিছু নয়, মানে—এটা তো আর তোমার কাজে লাগবে না ?

—কেন ? হঠাৎ কি আমি ধূমপান ছেড়ে সাধু বনে' গেলাম নাকি ?

—তা নয়, মানে—একটা সুটকেসে আর কতই ধরবে তোমার ? জামা-কাপড়ও তো নিতে হবে চারটী ? তা'ছাড়া আমারও ওটার ওপর অনেক দিনের লোভ।

—কি বললে ? অনেক দিনের লোভ ? হুঁ !

হরকালী একবার গম্ভীরভাবে নিবারণের দিকে তাকান—আমার এই সখের জিনিসটীর ওপর তোমার অনেকদিনের লোভ, কেমন ? বেশ। তা'হলে নিও...

'নিও' কথাটার মধ্যে যে সুরটী সেটী মোটেই বন্ধুবাৎসল্যের সুর নয়, তবু নিবারণ সুযোগ ছাড়েন না—গড়গড়ার ওপর থেকে কলকেটা নামিয়ে গড়গড়াটা হাতে করেন।

—কি ওটা তুমি এখুনি নিয়ে যাচ্ছ ?

—হ্যাঁ। নিলামই যখন—মানে দিলেই যখন···আচ্ছা হরকালী,

বাড়ী তো বেচবে—তোমার এই সব ফার্নিচার টার্নিচার ? মেলাই তো করে ফেলেছো—

গড়গড়ার ব্যাপারে বেশ একটু তেতে ছিলেন হরকালী, বিরক্ত ভাবে বলেন—ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই, জাহান্নামে যাক ওসব, বুঝলে ?

—তাই তো বুঝছি—মানে, তোমার ওই উড়নচণ্ডে লক্ষ্মীছাড়া ছেলেগুলোর হাতে পড়লে জাহান্নামে ছাড়া আর কোথায় যাবে ?

হরকালী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেন—আমার ছেলেদের সমালোচনা করতে তো তোমায় ডাকি নি নিবারণ !

—আরে ভাই, বন্ধুমানুষ তুমি, তাই এত ভাবনা—আমি বলি কি কাশী যাবার আগে বেচে দাও না ওগুলো—অবিশ্যি পুরো দাম কি আর পাবে ? সিকি আধা যা পাও—ধরো না কেন, আমিই তো নিতে পারি। সত্যিকথা বলতে কি হরকালী, রোজগার করি বটে, তোমার মতন এমন সাজানো গোছানো ফিটফাট বাড়ী আমার নয় —বরং এ জিনিসগুলো পেলে—

—তোমার বাড়ীটা সাজানো হয়, কেমন ?

হরকালীর কণ্ঠে বিদ্রূপের আভাস।

নিবারণ একগাল হেসে বলেন—সে যা বলেছ ! বিশেষ তো তোমার এই বুককেসগুলো পেলে কি সুবিধেই যে হয় ! বরাবরই এগুলোর ওপর ঝোঁক আছে আমার, তা' তোমার যখন আর কাজে লাগছে না...আমার বৌমারা বলেন, 'ও বাড়ীর জ্যাঠা-মশাইয়ের বাড়ী কেমন সুন্দর—আরশী-বসানো আলমারীর গাদা ! আমাদের নেই।' এইবার তাদের খেদ মিটলো। তা'হলে

মোটামুটি দর একটা দিয়ে ফেল হরকালী! মানে—নেহাৎ দেওয়া বলেই হু'চারশো টাকা দেওয়া—নইলে আমার কাছে আবার দর-দাম—হ্যাঁঃ!

হরকালী জ্বলন্ত দৃষ্টিতে নিবারণের দিকে মিনিট খানেক তাকিয়ে থেকে বলেন—বৌমাদের আর খেদ থাকে না, কেমন? আর বুককেসগুলো হ'লো তোমার? আর তোমার ছেলেদের?

—ছেলেদের! সে তুমি ইচ্ছে করে যদি কিছু দাও, মাথায় করে নেবে। মানে—চিরদিনের মত কাশীবাসী হবার আগে ওদের নিশ্চয়ই কিছু দিয়ে যাবে তুমি, নিজের ভাইপোর মতনই ভালো-বাসো যখন। তা' তোমার ছোট গাড়ীখানা আমার মেজ ছেলেটাকে দাও না ভাই। সে ডাক্তার মানুষ, আলাদা একটা গাড়ী থাকলে সুবিধে হয়।

—ও! তা'হলে গাড়ীটাও তোমার চাই?

—আমার নয়—নিবারণ উদাসভাবে বলেন—আমার ছেলের। ছোট একটা গাড়ীর ইচ্ছে তার বরাবরের। আর তোমার নিজের উড়নচণ্ডে হতভাগা ছেলেদের যখন তেজ্যপুত্তুর করে দিচ্ছ, তখন আমার সোনার চাঁদ নীরেন, নেপেনকে বেশ কিছু দিয়ে যাবে তুমি—

—চোপ রও!—হঠাৎ চীৎকার করে ওঠেন হরকালী—তোমার ছেলেদের গুণের কথা আর বলতে হবে না। বলি আমার ছেলেদের হতভাগা উড়নচণ্ডে বলবার কি রাইট আছে তোমার নিবারণ? কি রাইট আছে?

—চটছো কেন হরকালী? রাইট বল, প্রমাণ বল, সে তো আমার

পকেটেই আছে, কিন্তু মোটের ওপর আমার কথাগুলো যেন ভুলো না। আমি বরং এখনই গিয়ে একটা লরী পাঠিয়ে দিইগে—আলমারী-ফালমারীগুলোর জন্যে, আর নেপেনকেও বলিগে 'গাড়ীর ভাবনা তোর ঘুচলো'—আঃ হরকালী! কি বলে যে তোমায় ধন্যবাদ জানাবো—আজকের বাজারে এত সব জিনিস যোগাড় করা—

—তা'হলে আমার কাশীবাসে তোমার খুব সুবিধে হচ্ছে?

হরকালীর স্বর ভীষণ!

—নিশ্চয় নিশ্চয়, তা' আর বলতে—অবিশ্যি ছেলে-গুলোকে তেজ্যপুত্তুর না করলে এত সব কিছুই হ'ত না। সেটাও—

—সেটাও তা'হলে তোমার পক্ষে রীতিমতো লাভ?

হরকালীর স্বর বিভীষণ!

—সংসারের দিক দিয়ে দেখতে গেলে—

—লাভ? কেমন? তোমার সুবিধে—তোমার ছেলেদের সুবিধে—তোমার বৌমাদের সুবিধে—বলি হ্যাঁ হে নিবারণ, তোমার গুষ্টির সুবিধে করবার জন্যে আমি কাশীবাস করতে যাবো ভেবেছ?

—তা ভাই, 'কারো সর্ব্বনাশ কারো পৌষমাস' এ তো জগতের রীতি।

—নিকুচি করছি তোমার রীতির—উইল ফেরৎ দাও আমায় শিগগির—

—সে কি হে এত কষ্ট করে লেখালে—

—আমার খুসী লিখিয়েছি, আমার খুসী ছিঁড়বো, দিয়ে দাও—

নিবারণ করুণমুখে বলেন—তা'হলে এ উইল বাতিল ? ছেলেদের তেজ্যপুত্তুর—

—করবো না। হ'ল ?

—আর ওই ওরা তোমাকে অপমান করবে, বুড়ো বলবে—

—আলবৎ বলবে। তোমাকে তো বলতে যায় নি ? বুড়ো বলবে না তো কি তরুণ বলবে আমাকে ? সরে পড়ো হে নিবারণ, সরে পড়ো। মতলব বোঝা গেছে তোমার—হরকালী মিত্তির ঘাসের বিচি খায় না—

পকেট থেকে উইলখানা বার করে নিবারণ দুঃখিতভাবে বললেন—মতটা বদলালে তা'হলে ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হ'ল ?

—তা'হলে যাই, আর কি করবো ? সকালবেলা ঝুটমুট খানিক সময় নষ্ট!

আশা ভঙ্গের হতাশ মুখ নিয়ে নিবারণ গড়গড়াটা নিয়ে উঠে দাঁড়ান।

—ওটা নিচ্ছ মানে ? রেখে দাও—যেমন ছিল ঠিক তেমনি করে—হ্যাঁ হ্যাঁ কলকে বসিয়ে দাও—ব্যস, যেতে পারো তুমি।

—কাশীবাসও তা'হলে—

—করবো না—হয়েছে ? খুব দাঁও মারবে ভেবেছিলে, কেমন ? নাও এখন এইটি···

বয়সের মর্য্যাদা ভুলে পাকা-চুল হরকালী মিত্তির নিবারণ উকিলের মুখের সামনে চিরবিশিষ্ট আঙ্গুল তুটী নেড়ে দেন।

নিবারণ কি খুব বেশী অপদস্থ হ'য়ে গেলেন? হবার তো কথা—কিন্তু হলেন আর কই? দিব্যি তো প্রসন্নমুখে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বাড়ী ফিরলেন!

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই জামাই সাংঘাতিক বেঁকে বসলো—আর একদিনও থাকবে না। না একটি রাত্রিও নয়। সকাল বিকেল দুপুর সন্ধ্যা যখন ট্রেন পাবে চলে যাবে।

শুনে বাড়ীসুদ্ধ লোক 'থ'।

সেকেণ্ড ক্লাশ ট্রেন ভাড়া দিয়ে আট দিনের কড়ারে নেমন্তন্ন করে আনা হয়েছে নতুন জামাইকে, আর এখন কিনা জামাইয়ের মুখে এই বার্ত্তা !

কে কি বলেছে ? কে কি অপমান করেছে ? কি জন্যে জামাই হঠাৎ ক্ষেপে উঠলো ? নিশ্চয়ই অজান্তে কোন অপরাধ করে ফেলা হয়েছে। শনি, সত্যনারায়ণ, আর জামাই, কখন যে কিসে বিগড়ে যান, তা নরলোকের বোঝা অসাধ্যি।

শ্বশুর মশাই বাড়ীর প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে ডেকে রীতিমত জেরা সুরু করে দেন—গতকাল জামাই আসার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত কে কি কথা কয়েছে তার সঙ্গে। কিন্তু না—দোষণীয় কিছু পান না।

পানের মধ্যে আরসোলা পূরে দেওয়া—জুতার মধ্যে আলতা ঢেলে রাখা—ন্যাকড়ার লুচি, ময়দার সন্দেশ, আর ঘাসের শাকভাজা খাওয়ানোটা তো নেহাৎ পুরনো ঠাট্টা, আদি-অন্তকাল থেকে চলে আসছে! ওর জন্যে রাগের কি আছে ? ওদের বাড়ীতেই কি নতুন জামাইকে এভাবে অপদস্থ করবার চেষ্টা চলে না—শালা-শালী-মহলে ?

অতএব ওটা কারণ নয়।

শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী ছুটে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—এ কী শুনছি বাবা ? তুমি নাকি আজই চলে যেতে চাইছো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সে কি কথা বাবা, কত আশা করে আছি তুমি ছুটির ক'দিন থাকবে! ছেলেরা ধরেছে একদিন পিক্‌নিক করবে।

তা'ছাড়া আমি তোমাদের নিয়ে এখানের কালী মন্দিরে যাবো...

—কি করবো বলুন, না গিয়ে উপায় নেই আমার।

—বেশী দরকারী কাজ আছে কিছু ?

জামাই নিরুত্তর।

—কই আগে তো শুনি নি, কি কাজ ?

জামাই বোবা !

—তা' হলে যাবেই ?···শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্বশুর এসে বললেন—কি ব্যাপার ? হঠাৎ প্রোগ্রাম চেঞ্জ করছো কেন ? ছুটিটা এখানেই কাটিয়ে যাবার কথা ছিল···এখন না না, ওসব শুনবো না, চলে যাবে কি বল ? পাগল !

—আমায় মাপ করবেন।

শ্বশুর ভেবেছিলেন তাঁর অনুরোধ কি আর ঠেলতে পারবে ? যতই হোক শ্বশুর—পরম পূজনীয় গুরুজন ! দেখলেন জামাইটি কথায় ভেজবার নয়। তবু শেষ চেষ্টা...

—আচ্ছা কারণটা কি বল দেখি ? কাল এসেছ, তখন কিচ্ছুই বললে না !

—তখন বুঝতে পারি নি।

জামাই লাজুকও আছে বাচালও নয়, কিন্তু একগুঁয়ে বটে একখানি। তারাপ্রসন্নবাবু এখানকার কোর্টের একজন বাঘা উকিল, জজ সাহেব পর্য্যন্ত ওঁর দাবড়ানিতে ভয় খান, আর

তিনি কি না এই গোবেচারা জামাইয়ের কাছে কথা ভুলে যান? জেরা করে পেটের কথা আদায় করতে পারেন না?

বড় শ্যালক—তারাপ্রসন্নবাবুর বড় ছেলে, অফিস বেরোবার পথে একবার নিজের ক্যাপাসিটি পরীক্ষা করতে আসে।

—কি হে, খবর কি? তুমি নাকি রটাচ্ছো আজ চলে যাবে? না না, ওসব নিয়ে ঠাট্টা কোরো না—মা তো ভেবে নিয়েছেন সত্যি! যাও যাও রহস্য ফাঁস করে এসো।

—ঠাট্টা নয় বড়দা, আর একদিনও থাকা অসম্ভব, অন্ততঃ আমার পক্ষে।

—বাস্তবিকই যাবে?

—তাই ঠিক করলাম।

—কারণটা বলতে আপত্তি আছে কিছু?

—বলবার মতন নয় বড়দা।

—'রাবিশ'।...অস্ফুটে এইটুকু মন্তব্য করে বড় শালা আর একবার অন্তঃপুরে ফিরে যায়, তারপর ক্রুদ্ধস্বরে ডাকে—বুড়ি বুড়ি!

'বুড়ি' হচ্ছে বাড়ীর সবচেয়ে ছোট মেয়েটি, যার সম্পর্কে জামাই "জামাই"!

বুড়ি দাদার রুদ্রমূর্ত্তি দেখে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আস্তে আস্তে বলে—কি বলছো বড়দা?

—বিমলের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস্ কেন?

বুড়ি আকাশ থেকে পড়ে। এ কী অন্যায় দোষারোপ বেচারার ওপর! প্রতিবাদ করতেও সাহস হয় না।

—বল কেন ঝগড়া করেছিস্ লক্ষীছাড়ি? বাবার আদরে আদরে গোল্লায় গেছো একেবারে?

—কই আবার ঝগড়া করলাম—বাঃ রে?

—তবে ও চলে যেতে চায় কেন?

—আমি কি জানি?

বলে বুড়ি ছুটে পালায়।

বড়দারও দাঁড়াবার সময় ছিল না—অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে। নইলে হেস্তনেস্ত দেখে ছাড়তেন। বুড়িটা যে একের নম্বরের শয়তান আর আহ্লাদী এ তো আর জানতে বাকী নেই বড়দার!

এরপর এলেন ঠাকুমা।

এক গাল হেসে ঠ্যাঙ্ ছড়িয়ে বসে বললেন—নাত-জামাইয়ের এত রাগ কেন গা?

—কই ঠাকুমা রাগ কে বললে?

—আবার রাগ কা'রে বলে? রাগ কি আর গাছে ফলে? বলি—ধূলোপায়ে বিদায় চাইছো যে? রাগ নয় তো কি?

জামাই মাথা নাড়ে।

—তবে কি রান্না পছন্দ হয় নি ভাই? বুড়ো হয়েছি, রান্না ভুলে গেছি—আজ নয় তোমার শ্বাশুড়ী রাঁধবে।

—কি যে বলেন ঠাকুমা, রান্না আবার পছন্দ অপছন্দ!

—তবে?

—সে বলবার মতো নয়।

ঠাকুমা অনেক সাধ্য সাধনা করতে থাকেন, কিন্তু বিমলের সেই এক কথা—"সে বলবার মতো নয়।"

বড় শালী এসে ঠাট্টা জুড়ে দেয়—জামাইয়ের বোধ করি মাথার ভেতরকার ছ'চারটে 'স্ক্রু' আলগা আছে—তাই আচমকা কখন বিগড়ে বসে থাকে।···মধ্যমনারায়ণ তেল আর আইস-ব্যাগ আনা হোক, মাথা ঠাণ্ডা করে 'স্ক্রু'র প্যাঁচ্‌গুলো বসুক ভালো করে।... খোকার বুঝি হঠাৎ মার জন্যে মন কেমন করে উঠেছে? বাড়ীতে কি ভুলে ঝুমঝুমিটা ফেলে এসেছ? বলো তো একটা আনিয়ে দিই।...ইত্যাদি।

জামাই নির্ব্বিকার।

তা বলে যাওয়ার মতলব ছাড়ে নি। ইতিমধ্যে তার নিজস্ব সাবান, তোয়ালে আর শেভিং সেট গুছিয়ে সুটকেশ-জাত করে ফেলেছে এবং ফাঁক পেলেই টাইম টেব্‌ল ওল্টাচ্ছে।

অবশেষে হতাশ হয়ে সবাই পাড়ার সিংহী খুড়োকে ডেকে আনলে।

সিংহী খুড়ো জবরদস্ত লোক। আগে দারোগা ছিলেন, এখন 'পেন্সিল নিয়ে' বসে আছেন; কিন্তু নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে নয়। সারা পাড়ার হিসেব-নিকেশ তাঁর নখ-দর্পণে। মাসভোর পাড়াসুদ্ধ ছেলেমেয়ের অপরাধের তালিকা তৈরি করে রাখেন আর মাসান্তে নিজের বৈঠকখানায় "কোর্ট" বসিয়ে বিচার করেন। রায়ও দেন সঙ্গে সঙ্গে। জেল টেল তো নয়—শুধু জরিমানা।···

"বলাই, তুই সেদিন ঘুঁসি লাগিয়ে জগদীশের দাঁত ভেঙেছিস্।... তোর আট আনা।...খেঁদি, তুই ছোট ভাইটাকে ঠেঙিয়েছিলি।... তোর ছ আনা···নেপী, তুই রাস্তার ধারে 'ইয়ে' করিস্!...তোর চার পয়সা।···ন্যাড়া, তুই ভাইকে 'শালা' বলেছিলি।...তোর নগদ

একটাকা...” সমস্ত জরিমানা আদায় হলেই সিংহী খুড়ো তোড়জোড় করে একদিন চড়ুইভাতি লাগিয়ে দেন।

উঠোনের মাঝখানে উনোন জ্বেলে—প্রকাণ্ড ডেকচি চাপিয়ে—নিজেই রান্না করেন তোফা মাংসের ঝোল আর ভাত। তারপর—সমস্ত ছেলেদের ডেকে এনে মনের সুখে হৈ-চৈ করে চড়ুইভাতি পর্ব্ব সারা হয়। ছেলেরা জানে জরিমানার খাতায় নাম সই হলেই মাংসের ঝোল আসন্ন, তাই আপত্তি করে না।

এহেন সিংহী খুড়োকে ডেকে আনার কারণ অবশ্য ঠিক জরিমানা আদায়ের জন্যে নয়—জেরা করবার জন্যে। হাজার হোক, পুলিশের দারোগা। পেটের ভেতরকার বিশ বাঁও জলের তলার খবর টেনে বার করতে পারেন।

জামাই যায় যাক।

ও রকম একগুঁয়ে, জেদি, আর মুখ সেলাই করা জামাই থেকেই বা কি চতুর্ভুজ করে দেবে ?...কিন্তু কেন যাবে তার একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে যাক্ ?...শুধু “সে বলবার মতন নয়” বলে সরে পড়বেন—আর কলকাতায় গিয়ে আত্মীয়-বন্ধু-মহলে যা ইচ্ছে তাই বলবেন—ওসব চলবে না।

সিংহী খুড়ো কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে এসেই খাতা খুলে নাম ডাকলেন—“জামাই বিমল, বয়স চব্বিশ, বি. এ. পাশ. লম্বা একহারা গড়ন, ফর্সা রং”...কই হে বাপু?...এই যে ঠিক মিলে যাচ্ছে অবিকল।

বিমল বিস্মিত হয়ে বলে—কি ব্যাপার ? আমি কি নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলাম ? কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে খুঁজে বার করছেন ?

—না, বিচার হবে।

—বিচার? কিসের বিচার?

—১ নম্বর, তুমি শ্বশুর-বাড়ী থেকে পালাতে চাও—২ নম্বর, কারণ জানাতে চাও না।...জানো এ রীতিমত বেআইনী? যাবে যাও—বলে যাও।

—সেটা আজ্ঞে বলবার—

—'মতন নয়'? কেমন? শুনতে শুনতে কান পচে গেছে সবাইয়ের। বলবার মতন না হলেও বলতে হবে—এই আইন। না হলেই ফাইন।—বেশ লিখে নিচ্ছি ফাইন—পঁচিশ টাকা।

—সে কি? সে কি?...

জামাই ব্যস্ত হয়ে ওঠে—শ্বশুর-বাড়ী আসবার সময় কি আমার চেক-বই সঙ্গে এনেছি? এ কি চুরির দায়ে ধরা পড়া মশাই? ছেড়ে দিন—আমি দুপুরের গাড়ীতেই যাবো।

—যাবো বললেই যাবে? দিচ্ছে কে যেতে? জরিমানার টাকাটা সদ্ব্যয় হোক আগে?...কি বলিস্ মান্‌কে? এবার ভাতের বদলে লুচি, কেমন?

জামাই হতাশ হয়ে বলে—আপনাদের ভাত-লুচির রহস্য আমার বোঝা অসম্ভব—তবে জরিমানা? উঁহু সে আশা ছাড়ুন।

—তবে বলে ফেল ভায়া, খামোকা পাততাড়ি গুটোতে চাইছো কেন? ধরো—এরপর যদি বাড়ী থেকে ঘড়িটা আসটা আংটিটা বোতামটা হারিয়ে যায়—বদলোকে তোমাকেই সন্দেহ করতে পারে। পারে কিনা?

জামাই অবাক হয়ে বলে—বলেন কি?

—আবার কি ? ওই তো আইনের মার-প্যাঁচ। আমার এ হাতে আইন, আর ও হাতে 'ফাইন'।

—আমারও এ হাতে কাঁচকলা, আর ও হাতে লবডঙ্কা, বুঝলেন ? —বলে জামাই গরগর করে উঠে সুটকেশে তালা লাগিয়ে চুলে টেরি বাগাতে বসে।

সিংহী খুড়ো বিপুল ভুঁড়ির—মানে কোমর তো আর নেই—দু' পাশে দুই হাত রেখে দারোগাই চালে বলেন—তা'হলে কবুল করবে না তুমি ?

—ধেত্তারি নিকুচি করেছে—কবুল কবুল।...বলেছিলাম—বলবার মত নয়—কিছুতেই হল না। না শুনে আর ছাড়বেন না! তা সে—বলবার মত নয়—দেখবার মত—এই দেখুন।

ব'লে জামাই হঠাৎ বীরবিক্রমে খাটের বিছানা তচ্‌নচ্‌ করে গদি উল্টে ফেলে বিরক্ত স্বরে বলে—এই দেখুন, দেখুন—শুতে পারে এতে জ্যান্ত মানুষে ? একরাত কাটাবার পর দ্বিতীয় রাত কাটাবার সখ হয় কারুর ? পাগল ছাড়া ? দৈনিক আধ পোয়া করে রক্ত খরচ হলে কতটা জমাতে পারবো শ্বশুর-বাড়ীর মাছের মুড়োয় ? 'কবুল! কবুল!'—হয়েছে ? ছারপোকার ভয়ে দেশত্যাগী, শুনতে খারাপ বলেই বলতে চাই নি।...শ্বশুরবাড়ীর একটা বদনাম তো বটে!...আইন তো দেখাচ্ছেন! আমিও ইচ্ছে করলে নালিশ করতে পারি, জানেন ?

—তোমার আবার কিসের নালিশ হে ?

—কেন "নিমন্ত্রণের ছলে জামাই বধের চেষ্টা!" আট দিন থাকলে আর বেঁচে ফিরতাম বলে মনে করেন ?

হস্তী প্রমাণ সিংহী খুড়ো গম্ভীরভাবে বলেন—তা যা বলেছ ভায়া, ঠিক বলেছ। বাঁচতাম না—আমিও বাঁচতাম না। তোমরা তো আমার কাছে মশা। ক'ছটাক রক্তই বা আছে তোমাদের গায়ে ?

সকল অনর্থের মূল সেই বিরাট রক্তবীজ-বাহিনী ততক্ষণে গদি থেকে খাটের খুরোয়—খাটের খুরো থেকে ঘরের মেজেয় এবং সেখান থেকে কোঁচার খুঁট বেয়ে উঠতে সুরু করেছে খুড়োর ঢাকাই ভুঁড়ির উদ্দেশ্যে।...এখানে রসদ মিলবে সে কি আর ওরা বোঝে না ?

'ছার' পোকা মাত্র হলেও, নেহাৎ বোকা পাত্র নয় ওরা।
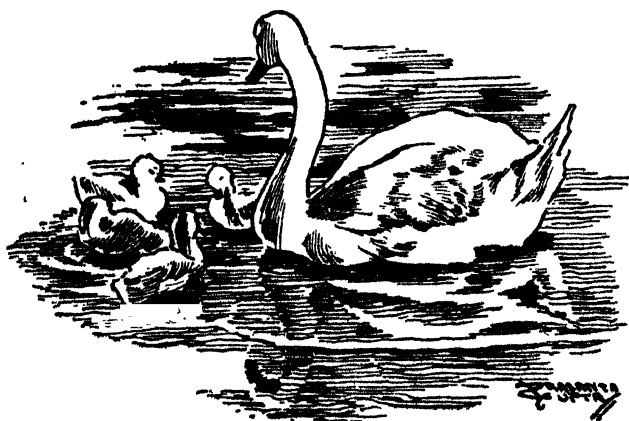
রতনলালের টাকায় ছাতা ধরছে—লোহার সিন্ধুকে মরচেই প'ড়ে গেল, তবু একটি আধ্‌লাও খরচ করতে নারাজ। টাকার কথা তুলেছ কি—অমনি সে জোড়হাত। কথাবার্ত্তা শুনলে মনে হয় সারা ক্লাসে তার মতন দীন-দুঃখী বুঝি দ্বিতীয়টি নেই।

সে বলে—"আমরা ভাই মুদি-মাকাল মানুষ, তোমাদের জুতোর সুখতলা। মেহেরবানি ক'রে রেখেছ, তাই দুটো খেয়ে প'রে টিঁকে আছি। তা-ই বা ক'দিন থাকতে পাচ্ছি বল? এ বাজারে ব্যবসা ক'রে আর বেশী দিন খেতে হবে না। কিসে যে তোমরা টাকা দেখ আমার—"

এরকম বেয়াড়া কথা শুনলে কার না রাগ হয়? বন্ধু-বান্ধব চটছে দারুণ ওর ওপর। পরের বেলায় 'ওয়ান পাইস্ ফাদার মাদার', কিন্তু নিজের বিষয়ে রতনলাল আমাদের মুক্তহস্ত। আট আঙুলে আটটা হীরের আংটি পরে, বাহান্ন টাকা জোড়ার ধুতি আটপৌরে পরে. রাতদিন মোটরে চড়ে এবং আরও কত কিছু করে যা তার পক্ষেই শোভা পায়—যার বাবা চিত্রগুপ্তের নোটিশ পাবার আগে ছেলের জন্যে একটি 'টাকার হিমালয়' গ'ড়ে রেখে যেতে পারেন। অবিশ্যি ওসব খরচে ওর 'দুধে হাত পড়ে না, জলের ওপর দিয়েই যায়'—অর্থাৎ ব্যাঙ্কের যা সুদ আসে মাসে মাসে, তা' থেকে সংসার-খরচ চালিয়েও আবার কিছু আসলে জমা দেওয়া চলে। এ ছাড়া আছে চালের আড়ত, যার জন্যে রতনলাল নিজেকে—বিনয় ক'রে 'মুদি-মাকাল' বলে চালাতে চায়।

যদিও রতনলালের সেই 'হিমালয়'-সৃষ্টিকর্ত্তা বাবা মগনলাল ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা মাথায় বাঁধতো আটচল্লিশ গজ মল্‌মল্ থানের এ্যায়সান্ এক পাগ্‌ড়ী, আর পায়ে পরতো নৌকোর মতন প্রকাণ্ড এক জরির নাগরা এবং কানে ঝোলাতো মুক্তোর মাকড়ী, আর কথা কইতো খাস্ মাড়বারের—রতনলাল কিন্তু সে সবের মধ্যে নেই। কথা কয় সে চোস্ত্ বাংলায় এবং সাজসজ্জায়ও সে মডার্ণ বাঙালী। সামান্য একটু যা ধরা প'ড়ে যায় সে ওই আংটির বহরে। আট আঙুলে আটটা আংটি, বাঙালীর ছেলের? কই দেখি নি তো কখনও। পরবেই বা কোথা থেকে? পাবে কোথায়? চোখেই দেখে নি ওরকম একখানা হীরে।

যদিও ওরা সকলেই প্রায় বড়লোকের ছেলে—সিতেশ, সুকান্ত,

অজিত, মণিময়, দেবব্রত—মোটর চ'ড়েও আসে, ভাল ভাল জুতো-জামাও পরে, তবু ওরা ডাল-ভাতের বড়লোক। ছাতুর বড়লোকের সঙ্গে তাদের আকাশ-পাতাল তফাৎ!

অজিত বলে—"হবে না টাকা? চোখের ওপর চামড়া না থাকলে টাকা জমানো খুব সহজ। আজ পর্য্যন্ত দেখলাম না এক পয়সা ছোলাভাজা কোনদিন কিনতে—অথচ পরের মাথায় হাত বুলিয়ে 'খ্যাট্'টি বাগাতে পারলে ছাড়ে না।"

সুকান্ত বলে—"ওর মাথায় হাত বুলিয়ে একদিন ভালমতন একটি 'খ্যাট্' বাগাতে পারা যায় তবে বলি বাহাদুর!"

"সে আর পেরেছ?"—দেবব্রত বলে: "পকেট হাতড়ে একটা দু'আনি পেলাম না কখনও যে দু'চারটে চিনেবাদামও খাওয়া যায়!"

"দূর, তার চেয়ে ধ'রেই পড়া যাক্"—মণিময় বলে পেন্সিলের মাথাটা কামড়াতে কামড়াতে: "উঠতে বসতে জ্বালাতন ক'রে মারলে শেষ পর্য্যন্ত এড়াতে পারবে না।"

অজিত বিরক্তির সঙ্গে বলে—"হ্যাঃ ওই করি আর কি, একদিন খেয়ে তো চতুর্ভুজ হব!"

মণিময়ের মত হচ্ছে—"চতুর্ভুজ হওয়া ব'লে কিছু নয়, ওর থেকে কিছু খসান নিয়ে কথা। দশটা টাকাও যদি খরচ করিয়ে দিতে পারি তো বুঝব। অন্ততঃ মুখের চেহারাখানাও দেখবার জিনিস হবে। দেখলি না সেদিন—পুওর ফণ্ডের খাতায় সই ক'রে ফেলে কী আপশোষ? বলে কিনা 'আমরাই তো পুওর ম্যান বাবা, চাঁদা ক'রে দিক না কিছু।' তাও তো দিলে মোটে চার আনা।"

অতএব আর মতভেদ রাখা উচিৎ নয়, রতনলালের পিছনে লাগা সম্বন্ধে।...

ইতিমধ্যে একদিন মণিময় একটা মজার খবর এনে দিলে "রতনলালের নাকি (যেটা সে বরাবর চেপে এসেছে) বিয়ে-ফিয়ে হ'য়ে গেছে কোন্ কালে, এখন সম্প্রতি একটি খোকা হয়েছে। এর চেয়ে সুবর্ণসুযোগ আর কি হতে পারে ?"

তারপরই সুরু হ'ল...

—"কি হে রতনলাল, একি শুনছি ?"

—"রতনলাল, এমন একটা দামী খবর এতদিন চেপে এসেছ ভাই ?"

—"রতনলাল, তোমাদের সমাজটি ভাই খাসা, বাল্যকালেই একটা হিল্লে হ'য়ে যায়। আর আমাদের ? হুঁ। তিনটি দাদা এখনও পথ আগলে ব'সে। লাইন ক্লিয়ার হ'তে চুল পেকে যাবে।"

—"রতনলালের কপালটা কিন্তু ফার্ষ্ট ক্লাস। এই বয়সে—গ্রাজুয়েট হবার আগেই, পিতৃদেব হ'য়ে বসল—সোজা সম্মান ?"

—"রতনলাল, আর ছাড়ছি না ভাই! এবার একদিন খাওয়াতেই হবে।"

প্রফেসর এন্. দত্ত ভালমানুষ লোক, তাঁর পিরিয়ডে ছাত্রদের প্রায় এই ধরণের পড়াশুনাই চলে।... ...

রতনলাল আমাদের—বলেছিই তো, সব সময় বিনয়ের অবতার। হাত দু'খানি জোড় করতে এক সেকেণ্ডও সময় লাগে না তার। সে আস্তে আস্তে সুরু করে—"কি বল ভাই, তোমরা সব আমীর-ওম্‌রা লোক, এই গরীবখানায় পায়ের ধূলো

দেবে, এও কি সম্ভব? রাম রাম! বসবে কোথায়? খাবেই বা কি? আমাকেই বরং পালা ক'রে দু'চার দিন খাইয়ে দে' তোরা। দেখছিস্‌ই তো কত খরচ বাড়ল আমার—খাওয়ার মুখ একটা বেড়ে গেল সংসারে।"

যেন এখুনি ওর সবে জন্মানো ছেলে ঘি, রুটি, লাড্ডু, মিঠাই খেতে সুরু করেছে!

সে যাক, রতনলালের বিনয়ে আর কেউ গলে না। সাব্যস্ত হ'ল—রতনলাল এক দিন ওদের পাঁচজনকে সিনেমায় নিয়ে যাবে নিজের খরচায়, আর খাওয়াবে পরিতোষ ক'রে। নাছোড়বান্দা বন্ধুদের জ্বালাতনে অস্থির রতনলাল অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসল।

শুধু মিনতি ক'রে সে বললে—"আমরা ভাই মেড়ো মানুষ, মাছ-মাংস আশা ক'রো না, তবে পেটটা ভরিয়ে দেব। তোমাদের কে. সি. দাস আর দ্বারিক ঘোষ আছেন—আর ঘরের লাড্ডু মিঠাই আছে।"

"তাই সই! সাথে সিনেমাটা রয়েছে যখন।"—ব'লে বন্ধুরা রাজী হয়।

শনিবার কলেজ ফেরৎ 'প্যারাডাইসে' গিয়ে হাজির হ'ল সবাই—যদিও "বন্ধন" ওরা সকলেই দেখেছে দু'-একবার। না দেখবেই বা কেন? তবু দু'বারের ওপর তিনবার দেখলেই বা ক্ষতি কি—পরের পয়সায় পাওয়া যাচ্ছে যখন? ভালো বই পাঁচবার দেখতেই বা কি দোষ?

"অমনি এক গ্লাস ক'রে আইসক্রীম, বুঝলে রতনলাল।"

—বলে সুকান্ত: "প্রোগ্রাম-বুকটা না হয় আমিই কিনব—নিজের পয়সায়। অতটা—সবটা আর চাপাতে চাই না তোমার ঘাড়ে।"

'কিনবে' মানে বাড়ী থেকে নিয়েই এসেছে একখানা, ছোট বোনের নিজস্ব সংগ্রহের ভাঁড়ার ওলোট-পালট ক'রে।

অজিত মন্তব্য করে—"নেহাৎ যেন থার্ড ক্লাস কিনে ব'সো না রতন, হাজার হোক তোমার নিজেরও তো একটা মান-মর্য্যাদা আছে।"

"রাম রাম! আর লজ্জা দিও না ভাই, রতনলাল যখন সাথে ক'রে এনেছে তোমা সকলকে, ইজ্জৎমাফিক কাজই করবে।" —বললে মণিময়।

"থার্ড ক্লাস টিকিট কিনব? সম্রম নেই আমার?—জবাব দেয় রতন।

একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাস টিকিটই কিনবে সে—ঝোঁকের মাথায় প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে।

মবলগ টাকা সে খরচ করবে আজ। বন্ধুদের টিট্‌কিরি আর সইবে না।...কিন্তু একি কাণ্ড! টাকার জন্যে পকেটে হাত দিতেই হাতটা সোজা নেমে আসছে কেন? গোলগাল কচুরী-প্যাটার্ণের হাতখানি রতনের। সাধারণ নিয়মে—পকেটে হাত ঢোকালে, আটকেই যায়—নামতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হাতটাকে থামতেই হয় শেষ পর্য্যন্ত। পকেট ভেদ ক'রে অবাধে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় কি ক'রে? রসগোল্লার মতন মুখখানি চট্‌ ক'রে বাসি-জিলেপীর মতই বা হ'য়ে পড়ে কেন?—কি ব্যাপার!

ব্যাপার আর কিছুই নয়—'পকেটমার'। ব্ল্যাক আউটের
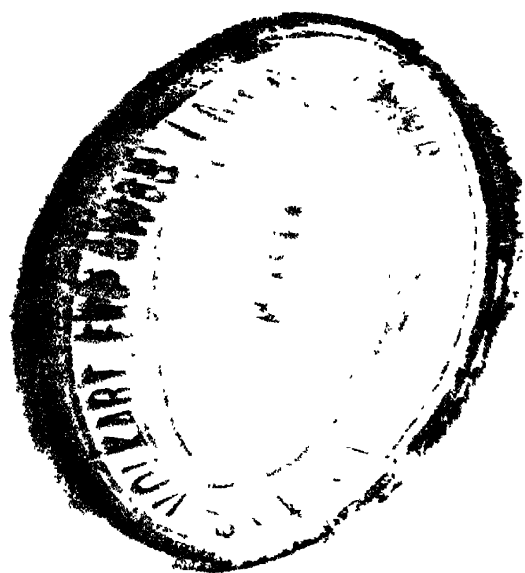
বাজারে, সিনেমা-থিয়েটারের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এই ভূত-নামানো গোছের 'আধো-আলো আধো-ছায়ায়' ভীড়ের মধ্যে পকেট তো কাটবেই লোকে। পেশাদারী পকেট-কাটিয়ে যারা—দস্তুরমত পকেট-কাট্‌নেওয়ালা—তা'রা ত কাটছেই, কেটে আসছে চিরকাল, কাটবেও। ভদ্দর লোকেই সুযোগ পেয়ে এই ব্ল্যাক্ আউটের সুযোগে কি করছে না করছে কে বলতে পারে?

কিন্তু যে-ই কাটুক, চমৎকার সাফাই হাতখানা তার। এমন ফাইন ক'রে—শুদ্ধু পকেটের তলাটুকুন্ কেটেছে, মনে হচ্ছে সরু কাঁচি দিয়ে সেলাই ক'টাই বুঝি কে কেটেছে ব'সে ব'সে।···মরুক গে, চুলোয় যাক্। মোটকথা হচ্ছে এই, পকেট-মারা গেলে টিকিট কেনা চলে না। অগত্যা ফিরেই যেতে হবে, আর উপায় কি?

কিন্তু ছিঃ ছিঃ তাও কখনও হয়? রতনলালের 'সরম' আছে, আর এদের নেই? পাশের লোকগুলো বলবে কি? রতনলালের পাশে দাঁড়ানো ওই দন্তবাগীশ টিকিওয়ালাটা যে হাসবে দাঁত বা'র ক'রে! ভাববে—'বাবুদের পকেটে নেই এক আনা পয়সা, প্রাণে আছে ষোল আনা সখ!'

'নাঃ কখনই না, যাক্ প্রাণ থাক্ মান।' প্রত্যেকেই নিজের নিজের পকেট হাতড়াতে সুরু করে। কিন্তু রতনলাল দিতে দিলে তো? 'হাঁ হাঁ' ক'রে উঠে বলে—"দোহাই ভাই, তোমরা একটি পয়সাও বা'র ক'রো না। সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। কি করব, আজ দেখছি নসিবটাই খারাপ।"—ব'লেই রতনলাল হাত থেকে একটা হীরের আংটি খুলতে উদ্যত হ'ল।

সবাই অবাক হ'য়ে গেছে, বলে—"ওকি হচ্ছে?"

"এই এটা বন্ধক রেখে এখন ত দেখে নিই, তারপর বাড়ী থেকে টাকা আনিয়ে দিলেই চলবে। সোফারটাকে ছেড়ে দিয়েই মুস্কিল হয়েছে—"

যদিও রতনলাল সোজা হিসেব দেখালে, কিন্তু এরা বাপু ওতে রাজী নয়। হীরের আংটি বাঁধা দিয়ে বায়োস্কোপ দেখা? সভ্যতা ব'লে একটা জিনিস আছে—না কি নেই? শুনলে যে গায়ে ধূলো দেবে লোকে।

কাজে-কাজেই সবাই রতনলালের হাত চেপে ধ'রে বললে—"ক্ষেপেছ? কি ভাববে ঐ দন্তবাগীশ লোকটা? আমরা তো এখুনি যাচ্ছি তোমার বাড়ী। ধার শোধ ক'রো তখন। দুঃখের বিষয় বহুত লোকসান গেল তোমার। কত ছিল পকেটে?"

"কে জানে কে খেয়াল রেখেছে? বড়নোট তো ছিল খান তিনেক, রেজকি পাঁচ-সাত টাকার থাকতে পারে। যেতে দাও, বেটা পকেটমার একটু ফূর্ত্তি ক'রে বাঁচুক।"

অজিত মনে মনে ভাবে···ইস্, ভারী যে লম্বা চৌড়া কথা দেখছি আজ!

যা হোক, পাঁচ বন্ধুর পকেট ঝেড়ে বেরোল কিছু টাকা—মানে কেউ তো আর হ্যাংলাঘরের ছেলে নয়! রতনলালও অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে নিজের নোটবুকে টুকে নিলে কার কাছে কত ধার নেওয়া হ'ল।

বায়োস্কোপ দেখাটা ভালই হ'ল। আইসক্রীমও বাদ গেল না, রতনলালই খাওয়ালে—(আপাততঃ ধার নিয়েই খাওয়ালে)—আর পরের পয়সায় পেলে কে না দু'চার গ্লাস খায়, দেনেওয়ালার ঢালা হুকুম পাওয়া গেছে যখন?

বায়োস্কোপ ভাঙলে সোজা রতনলালের বাড়ী। রতনলালের বাড়ীটা বাইরে থেকে দেখলেও আগে কেউ কখনও ভেতরে ঢোকে নি। সাজসজ্জায় 'মেড়ো মেড়ো' গন্ধ একটু পাওয়া গেলেও বাড়ীটা বড়লোকের বাড়ী ব'লে বোঝা যায়। বড় দালান, হলঘর, চারদিকে গাদা গাদা ছোট ছোট ঘর, বারান্দা, সিঁড়ি। আর দেয়ালে রয়েছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অয়েল-পেণ্টিং—বোধ করি রতনের পূর্ব্বপুরুষবর্গের, কারণ তাঁদের পাগড়ী আর ভুঁড়ি দেখলে 'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি'র কথা মনে প'ড়ে যায়।

ঘরের মেঝেয় কার্পেট পাতা। এরা মনে মনে ভাবলে, ভাগ্যিস্ বাবা সবচেয়ে দামী ভাল জুতোগুলো প'রে এসেছি। এই কার্পেটের ওপর বাজে জুতো প'রে বেড়ালে মান থাকত না। বাড়ী-ঘর দেখা হ'লে খাবার-ঘরে ডাক পড়ল। রতনলালেরা পরম নিষ্ঠাবান হিন্দু, জুতো প'রে খাবার-ঘরে ঢোকাই চলে না। তাই বাইরের দালানে জুতো খুলে রেখে আসতে হয়। উচিতও সেটা, কারণ, সারা ঘরের মেঝেয় জাজিম বিছান। প্রত্যেকের জন্য একটা ক'রে মোটা মোটা তাকিয়া, আর তার সামনে একটা ক'রে রূপোর রেকাবীতে গুটিকতক ক'রে ছোট এলাচ এবং একটা ক'রে আতরদানি।

গায়ে খানিকটা ক'রে আতর মেখে গোটা দু'চার এলাচ চিবিয়ে হাসি-গল্পে বেশ কিছু সময় কাটিয়ে, অবশেষে সিতেশ অধীর হ'য়ে ব'লে ওঠে—"কই হে রতনলাল, এই এলাচদানা চিবিয়েই থাকতে হবে নাকি? পেট যে চুঁই-চুঁই করছে—এখানেও কি পকেট মারল বাবা?"

"তাই তো হে রতন, ভাবিয়ে তুললে তুমি"—সুকান্ত বলে:

"ব্যাপার কি? খাওয়াবে ত শুনলাম দ্বারিক ঘোষ, আর কে. সি. দাস, এত বিলম্বের হেতু কি? গিন্নি রাঁধলেও বুঝতাম দেরীর মানে আছে।"

মণিময় বলে—"সত্যি রাতও যথেষ্ট হ'ল, কি খাওয়াবে বা'র কর বাবা, আর যার যা ধার আছে শোধ ক'রে ফেলে বিদায় দাও।"

ধারের কথাটা মণিময় ইচ্ছে ক'রেই তোলে, কি জানি গোলমালে যদি ভুলেই যায় রতন।

রতনলালের হাত জোড় করতে দেরী হয় না, সে কথা তো জানই। তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটটা তুলে গলায় দিয়ে, হাত জোড় ক'রে মিনতির সুরে সে বলে—"মেহেরবানি ক'রে গরীবকে মাপ করতে হবে ভাই, একটু দেরী হয়ে গেল। মনে কিছু ক'রো না। আর মনে করবার আছে কি? সবই তো তোমাদের জুতোর দৌলতে, আমি তো নিমিত্ত মাত্র।"

বাক্‌চাতুরীতে আবার কিছুক্ষণের জন্য চুপ থাকতে হয়। না থেকে উপায় কি, ভদ্রতা ব'লে জিনিস আছে তো? ... ...

নাঃ, ভারী ভুল করছিল তা'রা সত্যি, রতনলালের প্রতি অবিচার করছিল। এমনিতে এক পয়সার ছোলাভাজায় নারাজ হোক, বাড়ীতে ডেকে এনে খেতে দেবো না—এও কি হয়? ওই তো—দুটো চাকর বড় রূপোর থালায় ক'রে খাবার এনে হাজির করছে! এক-দুই-তিন···ছ'খানা থালা!

রূপোর গ্লাসে সরবৎ, রূপোর ডিবেয় পান। পেল্লায় আয়োজন। সন্দেশ, রাজভোগ, ছানার মালপো, শোন্‌পাপড়ি, মোহনপুরী, রসো-মালাই, মনোহরা, সরেরলাড়ু, পক্কান্ন, দইবড়া, সিঙাড়া, কচুরী,

ডালপুরী, ডালমুট্, ঝুরিভাজা, সেঁউভাজা ইত্যাদি 'মেড়ো-বাঙালী' সংমিশ্রিত নানাবিধ সুখাদ্য, তার ওপর আবার দই, রাবড়ী আর আনারস।

আঃ একে পেটের ভেতর অগ্নিদাহন অবস্থা, তার মুখে এই! যাকে বলে আগুনে জল পড়ল। এর পরে আর রতনলালকে কে কিপ্‌টে বলবে? খেতে খেতে মাঝে মাঝে রব উঠতে সুরু হ'ল—"জয় রতনলালকী জয়! জয় রতনলালের নিউ এডিসনের জয়!"

'নিউ এডিসন' মানে ওর নতুন খোকাটি আর কি! দেবব্রত একমুঠো ডালমুট মুখে ফেলে চিবোতে চিবোতে বললে—"বাচ্চাটীকে একবার দেখালে না রতনলাল? ওরই 'অনারে' ভোজটা হচ্ছে যখন—"

—"নিশ্চয় নিশ্চয়!···এই শিউশরণ, বাচ্চালোগ্‌কো হিঁয়া পর লে আও।"

'বাচ্চালোগ' তো একটি তুলোর পুঁটুলি বিশেষ। শিউশরণ তাকে নিয়ে আসতেই অজিত কথা তুললে—"আমরা হ'লাম সব পিতৃবন্ধু, একরকম পিতৃব্য তো বটেই, বিনামূল্যে ছেলের মুখ দেখা—ঠিক হবে?"

মণিময় দুটো পকেটেই হাত দিয়ে উল্টে বা'র ক'রে বলে—"কি আর দেব বাবা, পকেট তো গড়ের মাঠ!"

ব্যস্ত রতনলাল তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে—"আরে ভাই, তার জন্যে কি, সে দেওয়াই হ'য়ে গেছে ধ'রে নাও।"

কাজে-কাজেই 'ধ'রে নিয়ে' ছেলেটাকে নিয়ে দু-চারজন নাড়া-চাড়া করল। নেহাৎ শিশু, নিয়ে তো আর লোফালুফি চলে না।

এইবার ওঠার পালা, বেজায় খেয়েছে কিনা সবাই, নড়তে পারে না এমন অবস্থা। অনেক কষ্টে উঠে বলে—"রতনলাল, দেদার খাইয়েছ ভাই, খাবার টাবারগুলোও ফাষ্ট´ ক্লাস—না বাস্তবিক রতনলালের বদনামটা এবার ঘুচল—"

রতনলালের সেই পেটেণ্ট বিনীত হাসি, আর জোড়হাত। হেঁ হেঁ ক'রে বলে—"আমি আর কি করলাম ভাই, কিছুই নয়। আমার কোন কেরামতি নেই—সবই তোমাদের জুতোর দৌলতে। মেহেরবানি ক'রে কসুর মাফ ক'রো।"

—"বিলক্ষণ। কসুর কিসের? বিনয়ের অবতার একেবারে!·· কই হে আর নয়, ওঠ এবার। যাওয়া যাক, যথেষ্ট রাত হ'ল। কি রে সিতেশ, আরও খাবি নাকি?"

—"না বাবা, আর খেলে ভুঁড়ি সেলাই করতে ডাক্তার ডাকতে হবে।"

—"নাঃ, 'দেবা'টাকে নিয়ে পারা গেল না আর, এখনও ব'সে ব'সে ডালমুটের নুন-লঙ্কা চাটছে।"

—"আরে মিষ্টি-ফিষ্টি বেজায় খাওয়া হ'য়ে গেছে, মুখটা কি রকম যেন করছে।"

মণিময়টাই একটু ঠোঁটকাটা কিনা, রুমালে মুখ মুছতে·মুছতে গম্ভীরভাবে বলে—"কিন্তু রতনলাল, মিষ্টি খাইয়ে যেন ধারের কথাটা ভুলে যেও না।"

ওর পকেটে কিছু 'অধিক মাল' ছিল কিনা, তাই ওরই গা কর্‌কর্‌ করছে বেশী।

রতনলাল তার নিজস্ব হাসি ছাড়ে না—"আরে যেতে দাও না

ভাই। সামান্য কথা—ছোট কথা, সে তো আমার হিসেবের খাতায় উঠেই গেছে। এই যে”—ব’লে নোটবুকটা খুলে ধরে রতনলাল।

পরিষ্কার বাংলায় লেখা হিসেব। “বাচ্চাবাবুকো নজরানা” অর্থাৎ খোকার মুখদেখানি, আর কি!

সিতেশ চৌধুরী—তু’টাকা ছয় পয়সা।

অজিত দত্ত—এক টাকা বারো আনা।

সুকান্ত হালদার—তিন টাকা।

দেবব্রত ঘোষ—চার টাকা সাড়ে পাঁচ আনা।

মণিময় খাস্তগীর—ন’ টাকা তিন পয়সা।...

বায়োস্কোপে যার পকেটে যা ছিল তারই হিসেব।

সোজা হিসেব। তা ছাড়া ‘সামান্য কথা’ মনে রাখবার মত কথাই নয়।

পঞ্চরত্ন প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকায়। মুখ দেখে বোঝবার উপায় নেই একটু আগে এত খেয়েছে। ‘আমসির’ সঙ্গে তুলনীয় মুখ পাঁচখানি।

উঃ, ধড়িবাজ রতনলাল এমন বাবদ হিসেবটা ফেলেছে যে, কারুর আর আপত্তি করবার পথ নেই। ওই জন্যই ছেলে দেখাবার সময় বলছিল—‘ধ’রে নাও দেওয়াই হ’য়ে গেছে’। ওর ওই খ্যাঁদামুখো ছেলের মুখ দেখে মুঠো মুঠো টাকা দিতে কার দায় পড়েছিল? সাংঘাতিক ফিচেল—বায়োস্কোপ-হলেই লিখে রেখেছে দেখা যাচ্ছে।

কি আর করা যায়? মনের রাগ মনে চেপে দেঁতো হাসি

হেসে বলতে হয়—"তা বেশ বেশ, বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু রতনলাল, পকেট-কাটাটা তা হ'লে—"

—"আরে যেতে দাও না ভাই, সামান্য কথা ছোট কথা—পাতলা কাঁচি হাতে পেলে পকেটের সেলাই ক'টা কাটতে কতক্ষণ? আধ মিনিটের কাজ!"

অর্থাৎ তা হ'লে রতনলাল নিজেই, বাড়ী থেকে বেরোবার আগে, ওই আধ মিনিটের কাজটুকু সেরে বেরিয়েছিল!

আর কোন্ ভদ্রলোক সেখানে আধ মিনিটও দাঁড়াতে সাহস করে? কে জানে ফস্ ক'রে মুখ থেকে একটা রাগের কথাই বেরিয়ে পড়ে যদি। সামান্যের জন্যে বন্ধু-বিচ্ছেদ হ'য়ে যাবে? কোন রকমে মুখের হাসি বজায় রেখে বেরিয়ে পড়তে পারলে হয়। এ্যাঃ, শেষে কিনা ব্যাটা মেড়ো—তাদের মতন ওস্তাদ ওস্তাদ 'কলকাত্তাই' ছেলেদের আহাম্মুক বানিয়ে ছাড়ল?

"কৈহে শিউশরণ! আমাদের জুতোগুলো কোন্ দিকে ফেললে? তোমার মনিব-বাড়ী ব'সে থাকলে তো আমাদের চলবে না বাবাজী, নিজেদের আস্তানায় ফিরতে হবে তো?...এই তো এইখানে কার্পেটের ওপর ছাড়া ছিল—বেশ ছিল, তাকে আবার যত্ন ক'রে 'আয়রন চেষ্টে' তুলতে গেলে না কি?"— বললে মণিময়।

নীরেটমুখ্যু শিউশরণ এসে এক লম্বা সেলাম ঠুকে ভারী গলায় বললে—"জী হুজুর! লোট্টু চামার তো 'জুত্তি উত্তি' লে গই।"

আবার একবার মুখ-চাওয়াচায়ির পালা।...

"সোজা বাংলায় খুলে বল না হে বাপু ব্যাপারটা। 'লে গই' আবার কি! বড় যে গোলমেলে লাগছে।"—বললে দেবব্রত।

'সোজা বাংলায় কথা বল'—শিউশরণের চতুর্দ্দশ পুরুষেরও সাধ্য নেই। তবে অতঃপর সে যা বললে সেটা সোজা বাংলায় এই দাঁড়ায়—"পূর্ব্ব-বন্দোবস্তমত 'লোট্টু' নামক জনৈক মুচি বাবুদের জুতো পাঁচ জোড়া দশ টাকা হিসাবে পঞ্চাশ টাকা নগদ দামে খরিদ করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং শিউশরণ উক্ত টাকায় মনিবের পূর্ব্বপ্রদত্ত ফর্দ্দ মাফিক্ 'মিঠাই পিঠা' আনিয়া—রূপার থালায় সাজাইয়া…ইত্যাদি ইত্যাদি।"

মোটকথা, আগাগোড়া ব্যাপারটা আগে থেকেই সাজান ছিল, যায় লোট্টু মুচির আসার টাইম পর্য্যন্ত। রতনলাল বন্ধুদের জুতোর বদলে খাইয়েছে, অর্থাৎ—কিন্তু থাক্ বাকীটা না বলাই ভাল, স্পষ্ট ক'রে বলে আর কাজ নেই। হাজার হোক এদের একটা প্রেষ্টিজ ব'লে জিনিস আছে তো?

নতুন আর দামী দামী জুতো সব, এক এক জোড়া বিশবাইশ টাকার কম নয়।

জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে আর ক্রুদ্ধ হাসি হেসে পাঁচজনে সমস্বরে ব'লে উঠল—"বাঃ রতনলাল, বেশ! তোফা! চমৎকার! মার্ভেলাস্! ওয়াণ্ডারফুল!"

রতনলাল তাদের পেছনে পেছনে আসছিল। অতি বিনীত হাসি হেসে হাত দুটি জোড় ক'রে অমায়িক স্বরে বললে সে—"আগেই তো ব'লে রেখেছি ভাই, আমার কেরামতি কিছুই নেই, সবই তোমাদের জুতোর দৌলতে।"

পুতুল আব্দার ধরেছে সিনেমা না দেখে ছাড়বে না আজ!

হঠাৎ এক দিনের জন্যে কি একটা বই এসেছে নাকি অদ্ভুত ভালো। বলে—কি কিপ্‌টে হয়ে যাচ্ছিসরে ছোড়দা দিন দিন? যুদ্ধের বাজারে খুব পয়সা জমাচ্ছিস? এতদিন পরে শ্বশুর বাড়ী থেকে এলাম—একদিন সিনেমা দেখালি না?

কপিল অবহেলা ভরে উত্তর দিলে—আরে ধেৎতেরি সিনেমা, যে ছিঁচ্‌কাঁদুনে ছেলে হয়েছে তোর!

—বারে—ছেলে কাঁদুনে বলে একদিন বুঝি বেড়াব না?

ছেলের মাও প্রায় ছেলের মতন হয়ে দাঁড়ায়—এলাম হুদিন আমোদ করতে—

—বেশ তো চল্‌না, আজই চল্‌না, কত দেখতে চাস? 'চিত্রা', 'রূপবাণী', 'উত্তরা', 'শ্রী', নটায়—ছটায়—তিনটায়—যা খুসী যখন খুসী, কিন্তু ছেলে সামলাবে কে? তিনি যে হঠাৎ মাঝখানে ভেঁপু বাঁশী বাজাতে সুরু করবেন—আর ঘরশুদ্ধ লোক চেঁচাবে—"ছেলে চুপ করান"—সে সবের মধ্যে আমি নেই।

—তাই না আরো কিছু—পুতুল রীতিমত চটে ওঠে—নিয়ে যাবে, না হাতি করবে! একদিন বুঝি বৌদিরা সামলাতে পারে না?

—নো, নটু, না। তোমার যা ধূম্রলোচন ছেলে, থাকলে তো কারুর কাছে?

—মিশ্রী খাওয়ালেই থাকে—মুখ ভারী করে উত্তর দেয় পুতুল।

—অলরাইট। তুই তৈরি হয়ে নে, আমি সেরখানেক মিশ্রী এনে দিচ্ছি।

—সের খা-নে-ক?

—তাতে কি? ঘণ্টা তিন চারে সেরে ফেলবে অখন।

মিশ্রী নিয়ে এসে দাঁড়াতেই পুতুল চুপি চুপি বললে—শোন্ ছোড়দা, একটা ফন্দী করেছি, তুই বল্‌গে—'পুতুলের মামা-শ্বশুরের সঙ্গে পথে দেখা, ওর দিদি-শ্বাশুড়ী মর-মর, পুতুলকে শেষ দেখা দেখতে চান'—তারপর নিয়ে যাবি আমাকে মামা শ্বশুরবাড়ী—অর্থাৎ সিনেমা হাউসে।

—সে কি রে, জলজ্যান্ত বুড়িটাকে ফট্ করে মরিয়ে দিবি?

—জলজ্যান্ত না কচু, মরমর অবস্থায় বছর তিনেক কাটাচ্ছে—বিরেনব্বই বছর বয়স, ভীমরতি ধরা বুড়ি—

—তা যাক্ কিন্তু হঠাৎ এ ফন্দীটা মাথায় এল যে?

—আরে বুঝছিস না? 'সিনেমা দেখতে যাচ্ছি' বল্‌লে ছেলেটাকে নিয়ে যেতে বলবে। এই মাত্তর ঠাকুর ছুটি নিয়ে গেল অসুখ করেছে বলে—বৌদিদের মুখ হাঁড়ি!

—তবেই সেরেছে। চল্ তোর কি ফন্দী ফিকির আছে—দেখি।

বড় বৌদি শুনেই হাঁড়ি মুখ চূণ করে বললেন—আহা শেষ দেখা দেখতে চেয়েছেন, যাবে বৈকি, কিন্তু আমি যে এখুনি বাপের বাড়ী যাচ্ছি। ছোট বোনটাকে ক'নে দেখতে আসবে—সাজিয়ে দেবার লোক নেই—

—তোমার সেই ছোট বোন তো? সে নিজেই খুব সাজতে পারে—এক টিন পাউডারই মেখে নেবে হয় তো—কপিল মন্তব্য করে।

—তা' বললে তো হয় না—দেখতে এলেই সাজিয়ে দিতে হয়। মেজ বৌর কাছে রেখে যাও না?

গম্ভীর ভাবে উপদেশ দেন বড় বৌদি।

মেজ বৌদি দুই চোখ কপালে তুলে বল্‌লেন—ভবানীপুর যাচ্ছ? খোকাকে রেখে? দিদি চলে যাচ্ছেন? বল কি? সর্ব্বনাশ। আমিও যে বেরোচ্ছি গো—এই মাত্র চিঠি এলো—বন্ধুর ছেলের জন্মতিথি, না গেলে ভীষণ দুঃখিত হবে, উনি গেছেন উপহারের জিনিষ কিনতে...তা যাক্—সেজবৌ দেখবে অখন, তুমি যাও।

সেজ বৌদি গালে হাত দিয়ে চমকে উঠলো—বলি'

বেরিয়ে যাচ্ছিস ? দিদিও ? মেজদিও ? আর এই ঠাকুরের অসুখ ! আমার যে বিষ খেতে ইচ্ছে করছে গো।

—এনে দেব নাকি বৌদি ?—প্রশ্ন করে কপিল নিরীহ ভাবে।—কোনটা পছন্দ করো তুমি ? আপিং ? সেঁকো বিষ ? নাইট্রিক এসিড ? পটাসিয়াম সায়ানাইড—

—যাও সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না। জানি না বাবা, আমিও থাকছি না—আমার পিস্তুতো ভাইয়ের শ্বশুর মোটর একসিডেন্টে পা ভেঙ্গে বিছানা নিয়েছেন, দেখতে যাওয়া দরকার তো ?

যাক্—বড় বৌদি, মেজ বৌদি, সেজ বৌদির ভরসা গেল। অটোমেটিক্যালি দাদাদেরও। দেবীপ্রতিমাদের বাহন চাইতো এক একটি ?

—এখন ভরসা জ্যেঠামশাইয়ের—কপিল বললে।

—জ্যেঠামশাই ? সে কি রে ছোড়দা ?

—দেখ্ না বলে, বসেই তো আছেন।...আমি যে টিকিট কিনে আনলাম ছাই।

—কই ? কখন ?

—এই যে মিস্ত্রী আনতে গিয়ে—এখানের দোকানে পেলাম না, গেলাম হাতিবাগানে—ভাবলাম টিকিট ছুটোও নিয়ে নিই।

প্রস্তাব শুনে জ্যেঠামশাই শুধু অজ্ঞান হতে বাকী থাকলেন।

—তোমার ঐ ছেলে সামলাবো আমি ? ওই হিটলারী ছেলে ? দেওতার চেয়ে আমায় বেঁধে মার না বাবা। নয় সোজাসুজি বধ করো। অর্থাৎ —কিন্তু জ্যেঠামশাই, বেচারা পুতুলের দিদিশ্বশুর যে

—মেয়ো—

পুতুল অলক্ষ্যে চোখ টিপে চুপি চুপি বললে—'দিদি শ্বশুর' কিরে মুখ্যু ? দিদি শ্বাশুড়ী।

—হ্যাঁ হ্যাঁ—আহা বুড়ো মানুষ শেষ দেখা দেখতে চাইছে—এ সময় দুরন্ত ছেলে নিয়ে যাওয়া কি উচিত ?—করুণ ভাবে প্রশ্ন করে কপিল।

—আরে ও ছেলেকে রেখে ভবানীপুরে গেলে এদিকে আমার সঙ্গে 'শেষ দেখাটা'ও যে হবে না। আমার হাড় এক ঠাঁই মাস এক ঠাঁই করে দেবে তোমার ছেলে।

—মিশ্রী খেলে চুপ করে থাকবে জ্যেঠামশাই।—পুতুল আবেদন জানায়।

—মিশ্রী খেলে ? হিমালয়ের চূড়ো খেলেও চুপ করে থাকবে না। মিশ্রীটা বরং আমায় দিও ভিজিয়ে খাবো।...তা ছাড়া—আমাদের হরিসভায় আজ গোবিন্দবল্লভ গোস্বামীর পাঠ, সে না শুনলে জীবনই মিথ্যে।

আর বেশী কথা না বাড়িয়ে জ্যেঠামশাই এণ্ডির চাদরখানা গায়ে দিয়ে 'জীবন সত্য' করতে বেরিয়ে গেলেন।

—দূর ছাই যেতে চাইনে—কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে পুতুল।

কপিল সান্ত্বনা দিয়ে বলে—আরে আরে কাঁদিসনে, নিয়ে যাবোই, পয়সা দিয়ে টিকিট কিনলাম, ফেলে দেবো নাকি ? আচ্ছা হীরেলালের কাছে রেখে গেলেই তো হয়।

—হীরেলালের কত কাজ—

—আহা একদিন না হয় পরেই করবে কাজ।

ডাক শুনে হীরেলাল এলো। গোল-গাল গড়ন, নেড়া মাথায়

প্রকাণ্ড টিকির গোছা। খোকার চেয়ে খুব বেশী বিজ্ঞ নয়, তাকেও সামলাতে হয় মাঝে মাঝে।

কপিল গম্ভীরভাবে বলল—আরে ছিঃ, এত ছেঁড়া গেঞ্জি পরেছিস হীরেলাল ?

যদিও উদয়াস্ত সেই গেঞ্জিটিই হীরেলালের অঙ্গের ভূষণ, এই মাত্র নজরে পড়লো কপিলের তা নয়—তবু হীরেলাল নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে উত্তর দিলে—হাঁ ওতো ছিঁড়া আছে।

—আমার থেকে একটা নিবি ?

হীরেলাল আকর্ণ বিস্তৃত হাঁ করে বললে—জী হাঁ।

—আচ্ছা তুই খোকা বাবুকে একটু ঠাণ্ডা করে রাখ্, আমি আসছি, দিচ্ছি গেঞ্জি। আর দেখ্ এই মিশ্রী থাকলো, কান্নাকাটি লাগালে দিবি, বেশী থাকে তুই খেয়ে ফেলিস।

—শেষেরটাই আগে করবে—বলে পুতুল পালিয়ে গেল কাপড় বদলাতে।

ছবি শেষ হ'ল—'দি এণ্ড' দেখে উঠে দাঁড়াতেই পুতুল বললে—আমাদের ঠাকুরের মতন একটা লোক বসে আছে সামনে। ওই যে—

—আরে ঠাকুরই তো—দেখেছ অসুখ বলে ছুটি নিয়ে সিনেমা দেখছে। রোস ধরি বেটাকে।

"বিফল প্রাচীরের" পাশে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়ালো কপিল আর পুতুল, ভীষণ অন্ধকার কেউ চিনতে পারবে না সহজে।

ঠাকুরের সঙ্গে আর একটি উড়িয়া কুল-তিলক!

—হঃ জড় হউচি না ঘোড়ার ডিম হউচি, মু বাইসকোপ দেখিবুনি? চব্বিশ ঘন্টা কাজ অ কাজ অ—

কপিল কি বলতে গিয়ে থেমে গিয়ে বলে উঠলো—আরে এযে দাদা বৌদি। পুতুল দেখ্, বৌদির বোনকে ক'নে দেখতে এসেছে নাকি—

বৌদি চলেছেন গল্প করতে করতে—যাই ভ্যাগ্যিস মাথায় এসে গেল কথাটা—সিনেমার কথা বললে আস্ত রাখত না আমায়। বড় হওয়ার কি কম জ্বালা?

এরা বেরিয়ে পড়তেই পুতুল সজোরে একটা চিমটি কাটলে কপিলের হাতে—ছোড়দা দেখ্, মেজদা মেজ বৌদি। ব্যাপার কি?

—আর ব্যাপার! চুপ করো। কি বলতে বলতে আসছে দেখি।

মেজ বৌদি এক গাল হাসতে হাসতে আসছেন—"খুব দেখা হয়ে গেল ছবিটা, আরটু হলেই পুতুলের খোকা আগলে বাড়ী বসে থাকতে হ'ত...বন্ধুর ছেলের জন্মতিথি—হি হি হি! মাথা নেই তার মাথা ব্যথা।"

কপিল উদাসভাবে বললে—কে জানে হয়তো বা ছোট বৌদির সেই কার মোটর এ্যাকসিডেন্টও মিথ্যে, জ্যেঠামশায়ের গোবিন্দবল্লভের পাঠও বাজে, সকলে এসেছে সিনেমা দেখতে—

—কী কাণ্ড রে ছোড়দা, যা বলেছিস! ছোটদা ছোট বৌদিও এসেছে, কি বলছে শোন্। ও কী ফুর্ত্তি—

"আর বল কেন? সে—''সইয়ের বৌয়ের বকুল ফুলের বোনপো বৌয়ের ভাইজী জামাই গোছের যা হয় একটা নাম বলে—তার

ঠ্যাং ভেঙ্গে তবে নিস্তার। দেখি গে এখন পুতুল এলো কি না, দিদি শ্বাশুড়ী বুড়ি ম'লো না রইল।" ছোট বৌদি এই কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন।

পুতুল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে—জানি না বাবা, সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করেছে না কি?...ও কি জ্যেঠামশাইও যে—ছোড়দা? ও ছোড়দা, একি স্বপ্ন দেখছি? না আমরা পাগল হয়ে গেছি? জ্যেঠামশাই সিনেমায়?

আর একটি বুড়োর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন পুতুলদের থেকে হাত তুয়েক তফাতে—"চমৎকার হয়েছে ছবিটা—নাঃ বাঙলা ছবির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে আজকাল। আমাদের ছেলে-বেলায় বাঙলা বায়স্কোপের রেওয়াজ এত হয় নি—কী বাতিকই ছিল থিয়েটার দেখার—সারা রাত জেগে থিয়েটার দেখেছি। এখন—বেটা বেটিদের জ্বালায় কি দেখবার জো আছে? ভাবে বুড়ো হলেই বুঝি শুধু গোবিন্দ ভজতে হয়। এই তো—এখুনি ভাইঝি বললেন—"বেড়াতে যাবো—ছেলে সামলাও"—'গোবিন্দ'র দোহাই দিয়ে কেটে পড়লাম। আরে বাবু তোরা এখন ছেলে-পুলে মানুষ কর, সংসারধর্ম্ম কর—যা বয়স। আমরা চিরকাল খেটে এলাম—এখন একটু আমোদ-আহ্লাদ করব না? এই তো বয়স সখ সাধের...কে ও কপিল নাকি? পুতুলও যে? ব্যাপার কি? তোরা কোথা থেকে?

—আমিও তো আপনাকে সেই প্রশ্নই করতে যাচ্ছি জ্যেঠা-মশাই—

—আর বলো কেন বাবা। গিয়ে দেখি গুরুদেব—গোবিন্দ

গোস্বামী আসেন নি। কি সংবাদ? না প্রভুর সাধ হয়েছে তোমাদের এই সিনেমা না কি ঘোড়ার ডিম, তাই দেখবেন। বলেছেন 'এত লোক কেন দেখতে আসে—তাই দেখবো'। আমি এলাম তাঁকে খুঁজতে···তোরা?

—আমাদেরও তথৈবচ—সরল মুখে চোখ বড় বড় করে পুতুল বলে—গেলাম দিদি শ্বাশুড়ীকে দেখতে—না তিনি বাড়ী নেই, গেছেন ফুটবল ম্যাচ দেখতে—

—ফুটবল ম্যাচ দেখতে! দিদি শ্বাশুড়ী? কী বলছিস পাগলের মত?

—বাঃ পাগলের মতন কেন? বুড়ো হলে বুঝি দেখতে নেই? এই তো সাধ আহ্লাদের বয়স—স্বর্গে গিয়ে তো আর দেখতে পাবেন না! তাই ষ্ট্রেচারে করে নিয়ে গেছে ছেলেরা। তাই ছোড়দাকে বললাম—কেউ তো বাড়ী নেই, খালি বাড়ীতে এখুনি ফিরে গিয়ে কি করব—চল একটু সিনেমা দেখে যাই।...বেশ হয়েছে ছবিটা, না জ্যেঠামশাই?

জ্যেঠামশাই জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার পুতুলের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ ক'রে গট গট করে এগিয়ে যান।
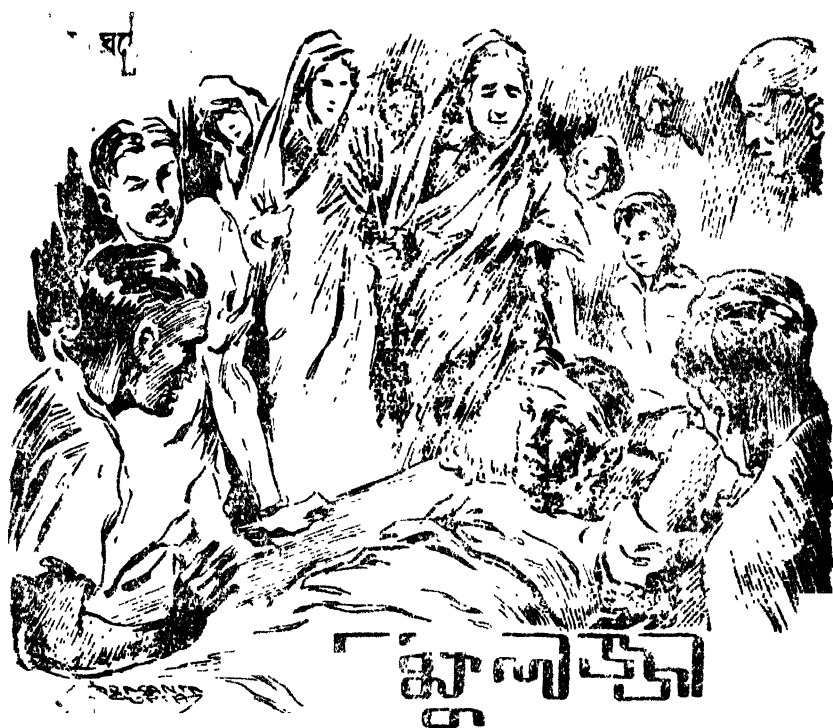
বললে বিশ্বাস করবে কিনা না জানি না—হঠাৎ আমি লটারিতে হাজার পঞ্চাশ টাকা পেয়ে গেলাম। শুনে তোমরা হয়তো মুচকি হেসে ভাববে—টাকা কিনা গাছের ফল? পেলেই হ'ল! লটারির টাকা, ক্রসওয়ার্ডের টাকা, এসব আবার সত্যি পাওয়া যায় নাকি কখনো? ওসব ছাপার অক্ষরেই দেখা যায়। এই তো আমাদের "অমুক" আজন্ম লটারির টিকিট কিনে আসছে, তোমার গে— "অমুক" তো ঠিকুজি কুষ্ঠি দেখিয়ে 'হাঁ' করে বসে আছে দৈবধন পাবে বলে। কই? পেয়েছে কেউ আজ পর্য্যন্ত?

তাও এক আধটা নয়—প...ঞ্চা...শ হা...জা...র ! হয়ে'

কিন্তু কি করবো, তোমাদের চোখ টাটাবে বলে তো আর সত্য গোপন করতে পারিনে! ভাগ্যক্রমে পেয়েই গেলাম। আর ওদের চেক্ ভাঙিয়ে টাকাটা একবার হস্তগত করে নিয়ে রেখে দিলাম আমার পাড়ার ব্যাঙ্কে।

পাড়ার বলে হেনস্তা মনে করবার কিছু নেই—ব্যাঙ্কটা ভালো।

তারপর টাকা আছে টাকার জায়গায়, আমি আছি আমার জায়গায়। পৃথিবী যেমন ঘুরছিল তেমনিই ঘুরছে, আমিও যেমন ঘুরছিলাম তেমনিই ঘুরছি—চাকরীর চেষ্টায়।

পাড়াপড়শী বা বন্ধু-বান্ধব, যাঁরা আমার এ-হেন ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে সনিশ্বাস আনন্দ প্রকাশ করে গিয়েছিলেন, তাঁরা বললেন—"তোমার আবার চাকরীর দরকার কি বাপু? একলা মনিষ্যি—পুষ্যির মধ্যে তো একটা চাকর—কত খাবে? পায়ের ওপর পা দিয়ে গ্যাঁট্ হয়ে বসে থাকো, সুদের টাকাতেই রাজার হালে চলে যাবে।"

কিন্তু "কলসীর জলের" উদাহরণও তো ফেলবার নয়!

তা'ছাড়া—হাত-পা থাকতে মানুষ বসে থাকতে পারে? অতএব এ দরজা থেকে ও দরজা. এ সাহেবের কাছ থেকে ও সাহেবের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছি। একটা হৃষ্টপুষ্ট চাকরী জোগাড় করতে পারলেই—আধলাখ টাকার একটি মোটা অঙ্ক খসিয়ে—পৃথিবীর যে সব লোভনীয় বস্তুগুলোর দিকে এতদিন বেচারার মত শুধু তাকিয়ে এসেছি—সেই সব বস্তু সংগ্রহ করে নিয়ে গুছিয়ে বসবো, এই ইচ্ছে।

ইতিমধ্যেই ক'নের বাবার চর আনাগোনা করতে সুরু করছিল—

কিন্তু ঘরের টাকা পরের মেয়েকে খাওয়াবার সখ আমার নেই জানিয়ে দিলাম। সুরেন আর আমি, নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। সুরেন আমার 'কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড', জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সব পারে ও। পারে না শুধু টাকা ফুরিয়ে গেলে জোগাড় করতে—মাঝে মাঝে ওই ঝামেলাটাই নিতে হতো আমাকে। আশা করছি ওটাও কমলো!

ভগবানের দয়ায় চট্ করে টাকা ফুরিয়ে যাওয়ার দুর্ভাবনাটা আর ভাবতে হবে না।

কথায় বলে "বিধি যখন মাপান উপরো-উপরি চাপান"—কথাটা সত্যি, নইলে এতদিন চাকরী খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম—জোটেনি, আর এখুনি ঝট্ করে জুটে গেল!

সবই ঠিকঠাক হয়ে গেল—তবে চেয়ারটা খালি হ'তে প্রায় মাস দেড়েক বাকী আছে। আপাততঃ যিনি চেয়ারের মালিক, অক্টোবরের আগে তাঁকে নামানো যাবে না এইরকম বন্দোবস্ত।

ভেবে দেখলে মন্দ কি? এই দু'মাস স্ফুর্ত্তি করে বেড়াই, আর গাড়ী, রেডিও, রেকর্ড, গ্রামোফোন, আলমারি, দেরাজ, টেবিল, আয়না, জামা, কাপড়, জুতো, ছাতা, বই, বুকসেলফ্, ক্যামেরা, পোর্টেবল্ টাইপরাইটার ইত্যাদি যাবতীয় লোভনীয় জিনিস সংগ্রহ করি। আগের আমল হলে অবিশ্যি ওই টাকাতেই সব হ'তে পারতো নতুন আনকোরা। এখন কিছু কিছু 'দ্বিতীয় হস্তের' চেষ্টা দেখতে হবে, তাই দেখছি। দুপুর রোদে ট্রামে বাসে টো-টো করে বেড়াচ্ছি যেখানে সেখানে—হঠাৎ যা হ'ল—সেই কথাটাই বলি।

চলন্ত ট্রাম থেকে নামা আমার চিরকালের পেশা, রোজ নামি, সেদিনও নামছি—হঠাৎ কোথা দিয়ে যে কি ঘটে গেল জানি না। শুধু মনে পড়ে যেন—একটা প্রবল ভূমিকম্প...একটা প্রচণ্ড ঝড়... একটা প্রাণান্ত আর্ত্তনাদ...একমুঠো পীতাভ সরষে ফুল...ব্যস্ তার পরেই সব অন্ধকার! ...যেন মহাসমুদ্রের তলায় গিয়ে ঠেকলাম।

কতক্ষণ জ্ঞানহারা হয়ে ছিলাম ভগবান বললেও বলতে পারেন, কে যে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে বাড়ীতে তুলেছে—ভগবানও বলতে পারেন কিনা জানি না—মোটের মাথায় জ্ঞান পেয়ে দেখলাম—শুয়ে আছি আমার নিজের বিছানায়। আর সেই বিছানা ঘিরে—সামনে পিছনে—এপাশে ওপাশে—দরজার সামনে—জানলার মাথায়—বারান্দায় আর সিঁড়ির মুখে—অগণিত নরমুণ্ডের সারি!

বিকারের ঝোঁকে দেখা কায়াহীন ছায়ামূর্ত্তি নয়, দস্তুরমত রক্তমাংসের ব্যাপার। টাক আর টিকি, বাঁকা সিঁথি আর ব্যাক্‌ব্রাশ, ঘোমটা আর আধ-ঘোমটা, চেনা আর অচেনার—বিরাট সমারোহ। সেই অনন্ত জোড়া চোখ আমার একখানি মাত্র মুখের পানে ড্যাবডেবিয়ে তাকিয়ে আছে।

আন্দাজ করলাম, আমি মারা গেছি এটা তারই শোকবাসর। এত সকলে কষ্ট করে আমার শেষকৃত্য করতে এসেছে দেখে বড় কৃতজ্ঞতা বোধ করছিলাম, কিন্তু মারা যাওয়ার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের রীতি আছে কি নেই, ঠিক জানা ছিল না ব'লেই আবার চোখ বুজলাম।

কিছুক্ষণ পরে অনুভব করলাম, হয়তো পুরোপুরি মরিনি।

এতগুলো কণ্ঠের সম্মিলিত বাক্‌যুদ্ধের থেকে আবিষ্কার করলাম—সৃষ্টিছাড়া গোঁয়ার্ত্তুমির ফলে নাকি মরতে বসেছিলাম।

সত্যি কথা বলতে কি—এত সব প্রায় অপরিচিত বা অর্দ্ধ-পরিচিত আত্মীয়বর্গের সঙ্গে বা পাড়াপড়শীর সঙ্গে যে খুব বেশী "গলায় গলায় ভাব" ছিল এমন নয়, কিন্তু মহানুভব এঁরা আমার বিপদ দেখে স্থির থাকতে পারেননি—ছুটে এসেছেন।

হায়! ওবছরে যখন টাইফয়েড জ্বরে একচল্লিশ দিন বেহুঁস হয়ে পড়েছিলাম, তখন যদি এঁরা খবর পেতেন! বোধ হয় পাননি বলেই আমার অত দুর্গতি গেছে, একলা সুরেন ক'দিক সামলায়?

কিন্তু এবারে? কে কা'কে খবর দিলে কে জানে!

জ্ঞানটা আর একটু পরিষ্কার হ'তেই—(হায় তখন কে জানতো জ্ঞানের রাজ্য সীমাহীন)—সকলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললাম—"এখন বেশ ভালো বোধ করছি, এইবার এক পেয়ালা চা পেলেই চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারি—"

'হাঁ হাঁ' করে যোগীন মাষ্টার ছুটে এলেন—"বলেন কি মশাই, এ অবস্থায় চা? স্রেফ বিষ যে! বরং ঠাণ্ডা একগ্লাস মিশ্রীর পানা কিংবা ডাবের জল—"

—"আরে রেখে দিন্ আপনার ডাবের জল"—আমার জ্ঞাতি ভাগ্নে গোরাচাঁদ তেড়ে উঠলো—"যদি বাঁচতে চাও অমিয় মামা, নির্জ্জলা এক আউন্স ব্রাণ্ডি। দেখেছি তো খেলার মাঠে! আধখানা শরীর উড়ে গেল—বাকী আধখানা নিয়েই ঝেড়ে উঠে 'রাণ' দিলে—কার জোরে? ওই ব্রাণ্ডির।"

—"ওসব ব্যাণ্ডি ম্যাণ্ডির কথা ছেড়ে দাও বাছা"—একটি আধময়লা থানপরা বিধবা এগিয়ে এলেন—"তার চেয়ে একটু হালুয়া করে দিই, গরম গরম খেয়ে গায়ে বল পাক। কথায় বলে হাঁটু ভাঙা! বাছার সেই হাঁটু গেছে ভেঙে।"

মুখ দেখে মনে হ'ল কোথায় দেখেছি যেন, কিন্তু স্মরণ হচ্ছে না—ভাবছি কে হতে পারেন ইনি। তিনি নিজেই সন্দেহ ভঞ্জন করে দিলেন—"আমায় চিনতে পাচ্ছো না বাবা অমিয়? আমি যে তোমার মাসী হই! তোমার মার আপন জ্যেঠতুতো ভাইয়ের সাক্ষাৎ মামাতো বোন। আহা বিপদ শুনে দুঃখে আর বাঁচিনে।...তা' একটু গরম হালুয়া করে দিই—কেমন?"

ব্যস্ত হ'য়ে বলি—"আপনি কেন কষ্ট করবেন? আমার চাকরই করে দেবে···সুরেন শোন—"

'সাক্ষাৎ মামাতো বোন' আরো ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন—"ওরে বাবা, এখন আর চাকর বাকরের হাতে ছেড়ে দিতে পারি তোমায়? কত দুঃখে প্রাণটুকু যদি ফিরেছে—"

আধময়লা থানের ওপর টেক্কা দিয়ে একটি চওড়াপাড় ফরসা শাড়ী এগিয়ে এলেন—"সে কথা আর বলতে? তোমার মামা তাই বলছিলেন, অমিয় কি আমার পর? আমাদের 'খেঁদির' ছেলে ও, আজ 'খেঁদি ঠাকুরঝি' নেই তাই—"বলে প্রায় বিশবছর আগের শোক স্মরণ করে গলাটা কাঁপাবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু শুধুই তো মামী মাসী নয়? পিসিও আছেন। রক্তের সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে বেশী নিকট বলেই বোধ করি আমার রক্তপাতে কাতর হয়ে এতক্ষণ শুকনো চোখ দু'টি আঁচলে রগড়ে

রগড়ে প্রায় পাকা করমচা করে তুলেছিলেন, এখন—খেঁদির সূত্র ধরে মামীর এতদূর ঘনিষ্ঠতায় বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন—"যে যাই বলুক অমি, তুই যে আমার হাবুলদার ছেলে সে তো কাউকে বলে বেড়াতে হবে না—প্রাণের টান দেখলেই বোঝা যাবে। কথায় বলে—'বাপের বোন পিসি, ভাতকাপড় দিয়ে পুষি'—তা' নইলে যেই মাত্তর শুনলাম, মুখের ভাত ফেলে ছুটে এলাম কেন?"

অপ্রতিভের একশেষ হয়ে বলি—"ছি ছি, কি অন্যায়! খাওয়া হয়নি আপনার? তা'হলে সুরেন কিছু মিষ্টিটিষ্টি এনে দিক্ একটু জল খান।"

—"তার জন্যে তোকে ব্যস্ত হতে হবে না বাবা, বিধবার আবার উপোস, পাঁচ দিন না খেলেও—"

পাড়ার সবজজ-গিন্নি একখানি বেতের চেয়ারের মধ্যে কোনো প্রকারে নিজেকে ঢুকিয়ে দিয়ে পাখা নিয়ে হাওয়া খাচ্ছিলেন—একটু মুচকি হেসে বললেন—"না না, ব্যস্ত তোমায় হতে হবে না বাবা, ব্যবস্থা হয়েছে বৈ কি। এই যে সুরেন ছানা, দই, ডাব আর মর্ত্তমানের ছড়া নিয়ে বাড়ী ঢুকলো দেখলাম।"

পিসিমার কালিমাখা মুখের দিকে চাইতে পারি না।

পাশের বাড়ীর যে দন্তমাণিক ছোকরাটিকে দু'চক্ষে দেখতে পারিনে, দেখি সেও এসে দাঁড়িয়ে আছে। মামী মাসীদের একটু থামতে দেখে এগিয়ে এসে একগাল হেসে বলে—"এই যে দাদা, জ্ঞান ফিরেছে? মনে কিছু করবেন না—বলি তা'হলে—আপনি দাদা মহাকেপ্পন! অতগুলো টাকা মুফৎ পেলেন—একখানা

কিনতে পারলেন না? সেই টো-টো কোম্পানীর ট্রামে চড়ে আনাগোনা। ভাঙবে না হাঁটু? ভগবানই দিলেন ভেঙে।”

ভগবান বেছে বেছে তাকেই খবরটা দিয়ে গেলেন কেন জিজ্ঞেস করতে গিয়েও বললাম—“গাড়ী আজকাল চট্ করে কেনা শক্ত—খুঁজছি তো একখানা—”

—“একখানা? কত চান? কাটুন একখানি হাজার দশেকের চেক্, এখুনি গাড়ী এনে দোরে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি। শুধুই ‘ফ্যা ফ্যা’ করে বেড়াই না দাদা—অনেক তালে থাকি।”

—“ভালো গাড়ী?”

—“ভালো তো নিশ্চয়, তবে যদি ‘রোলস্ রয়েস’ চান—আলাদা কথা। তবে অবিশ্যি দাম যোগাতে আর একবার ফার্ষ্ট প্রাইজ পেতে হবে।”

বললাম—“পাগল! ছোট্ট একখানা ‘বেবি’ গাড়ী হলেই চলে যাবে, অনেকদিন থেকে সখ আছে!

যদিও ছোকরাকে দু’চক্ষে দেখতে পারিনে, তবু মনে হ’ল ওর ‘থ্রু’ দিয়ে গাড়ীটা যদি সুবিধেয় পেয়ে যাই মন্দ কি? সত্যি অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়ায় বটে, খবর রাখে অনেক কিছুর।

সকন্যা সবজজ-গিন্নি উঠে যাবার সময় তাঁর কন্যারত্নটি—যিনি লরেটোয় সিনিয়র কেম্‌ব্রিজ পড়েন—পরামর্শ দিয়ে গেলেন, এই সময় একটা রেডিও সেট্ না কেনার কোনো মানে হয় না, রোগীর মন প্রফুল্ল রাখতে ওর চেয়ে অপরিহার্য্য আর কি আছে?

আস্ত থাকতে এঁদের সঙ্গে খুব যে যোগাযোগ ছিল এমন নয়।

কিন্তু এমন ভালো এঁরা যে, ভেঙে পড়ার খবর পেয়েই তুলে ধরতে এসেছেন।

পাড়ার লোকেরা গেলেন এক এক ক'রে। কিন্তু আমার নিকট-আত্মীয়বর্গের ওঠার আর নামটি নেই। এদিকে হাঁটুর যন্ত্রণা প্রবল হয়ে উঠছে, প্রাণ খুলে 'উঃ আঃ' না করলেই নয়।

অবশেষে বাধ্য হ'য়ে বলি—"সুরেন,এঁদের সব রাত হ'য়ে যাচ্ছে—"

সঙ্গে সঙ্গে বা একসঙ্গে অনেকগুলো 'হাঁ হাঁ' শব্দ শুনলাম।'

"তার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না"··· "ওর জন্যে মাথা ঘামিও না"... "আমাদের জন্যে ভাবতে হবে না"··· ইত্যাদি। আমাকে এ অবস্থায় ফেলে গেলে বিবেকের কাছে জবাব দেবেন কি?

তারপর?—

তারপর থেকে আমার সেই খুড়তুতো মাসীমা, মাসতুতো পিসিমা, পিসতুতো মামীমা, মামাতো মেসোমশাই, জ্যেঠতুতো দাদার শালা, আর জ্ঞাতি বৌদি রয়েই গেলেন।

পাড়ার লোকেরা? তাঁরা আমায় ছাড়লেন বটে—তবে এই সব উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা আত্মীয়বর্গের খুঁৎ ধরা ছাড়লেন না। মাঝে মাঝে এসে চিকিৎসার ত্রুটি ধরে খুঁৎ খুঁৎ করে যান।

মানে—এই ভগ্ন-হাঁটু দুর্য্যোধনের জন্যে অনেকেরই খেয়ে শুয়ে সুখ রইল না।···আর সেই দন্তমাণিক ছোকরা? সে তো বোধ হয় আধখানা রোগাই হয়ে গেল আমার জন্যে খেটে।

মোটর, রেডিও সেট্ আর গ্রামোফোন কেনার ঝকমারি তো সোজা নয় আজকালকার দিনে। ত'ার উপর শ'খানেক রেকর্ড নির্ব্বাচন, সেই কী চাট্টিখানি কথা?

আমি অবিশ্যি বলেছিলাম—এত তাড়াতাড়ি কি?—নিজে একটু না দেখে শুনে অত টাকার জিনিস কেনা—সত্যি প্রাণ করকর করে বৈ কি!

কিন্তু ওঁরা আমাকে বোঝালেন—মানে বুঝিয়ে ছাড়লেন—শুয়ে শুয়ে তাকিয়ায় ঠ্যাং তুলে দিয়ে গান শোনবার সুযোগ, এ জীবনে আর নাও পেতে পারি।

আর এই যে রাতদিন ডাক্তার-বাড়ী আর ডাক্তার-খানায় ছুটোছুটি—বাড়ীর গাড়ী থাকলে সুবিধে কত? হরদম ট্যাক্সি ভাড়া দিতে হয় না। আমার ধারণা ছিল—চোট্‌টা এমন কিছু মারাত্মক নয়, কয়েক কৌটা আর্ণিকা, আর খাবলা কতক চূণে হলুদেই সারিয়ে তুলতে পারবো—কিন্তু আমি পাগল হয়েছি ব'লে তো আর আমার হিতৈষীরা পাগল হন নি?

ষোল টাকা, বত্রিশ টাকা, আর চৌষট্টি টাকা ভিজিটের ডাক্তারগুলো তা'হলে আছেই বা কি করতে? প্রাণের চাইতে তো টাকা বড় নয়? আর কোনো হাঙ্গামাই আমার পোহাতে হচ্ছে না যখন—শুধু চেক্ সই করা ছাড়া।

কাজেই ডাক্তার সেনের ওষুধ খাচ্ছি, সরকারের ইনজেক্‌শন

নিচ্ছি, আর তালুকদারের লোশন লাগাচ্ছি। কবরেজি মালিশও এনেছিল একটা—তবে মালিশ করবার সময় হয় না সুরেনের, তাই রেহাই পেয়েছি।

মালিশ করা ছেড়ে—আমার ঘরে ঢুকতেই সময় পায় না সুরেন।

বাড়ীতে মেম্বার বেড়েছে কত? তাদের সকলের ফাই-ফরমাস সেরে তবে তো আমার? আমিই বলে দিইছি—ওঁরা যা বলেন

শুনতে। হাজার হোক নিজেদের সংসার ফেলে যখন আমার ভালোর জন্যেই এসে রয়েছেন। আমারও একটা চক্ষুলজ্জা আছে তো ?

বেলা আটটা বেজে গেছে। সকাল থেকে চা পাইনি। খবরের কাগজখানা নিয়ে তেষ্টা মেটাবার চেষ্টা করছি—আর ভাবছি চা চাইবো কিনা। হঠাৎ আমার সেই জ্ঞাতি বৌদি এক পেয়ালা ধোঁয়া-বিহীন চা এনে ঠক্ করে টেবিলে বসিয়ে দিয়ে বিরক্তস্বরে বললেন—"রুগীর বাড়ী একটা স্টোভ নেই, আশ্চর্যি ! সারা বাড়ীতে একটা সস্‌প্যান খুঁজে পাই না, অদ্ভুত ! এসব বাড়ীতে নার্সিং করা—অসম্ভব।"

অপ্রতিভের একশেষ হয়ে বলি—"কে বা গোছ করে, যা করে সুরেন—"

—"তবে ডাকুন আপনার সুরেনকে—একখুনি একটা স্টোভ, এক বোতল স্পিরিট, একটা সস্‌প্যান, চারখানা এনামেলের প্লেট, আধ ডজন চামচে, আর খান দুই তোয়ালে আনিয়ে নিই।"

ভয়ে ভয়ে বলি—"এখনকার বাজারে জিনিস কি চট ক'রে পাওয়া যাবে ?"

—"বেশ, তবে আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিন্, অসুবিধে ক'রে কাজ করা আমার দ্বারা হবে না।"

—"না না, সে কি কথা ? ডাকুন সুরেনকে—"

—"আপনার আদরের চাকরের টিকি দেখাই ভার।"

বৌদির অন্তর্ধানের পরই পিসিমার আবির্ভাব।

—"আমাদের তো আর থাকা চলে না অমিয় !"

—"সে কি পিসিমা, কেন ?"

—"একটা জিনিষ কিনতে ব'লে তিন ঘণ্টা 'পিত্যেস্‌ করে বসে থাকা আমার পোষাবে না। আজ 'তালনবুমীর বেরতো', তার সব উয্যুগ যোগাড় চাই—কি না? তোমার রোগে সেবা করতে এসে তো ধর্ম্ম-কর্ম্ম খোয়াতে পারি না? তা' তোমার সেই চাকর বাবু আজও গেছেন কালও গেছেন। ভট্‌চায্যি আসবার সময় হ'য়ে গেল—মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে আমার।"

ইচ্ছেটা কিন্তু পিসিমার একলারই করছিল না। করছিল আমারও।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে হচ্ছে মরে ভূত হয়ে গেছি। তা' সে একরকম ভূতই, 'দশচক্রে ভগবানও ভূত' হন তো মানুষ! কিন্তু কবে এ চক্র শেষ হবে চক্রধারীই জানেন।

এতদিন ধ'রে দুধ-সাবু আর ঝোল রুটি খেয়ে খেয়ে অরুচি লাগছে—ভাবলাম সুরেনের কাছে দু'খানা গরম লুচি আর আলু-মরিচের বায়না নিই।

কিন্তু ডাকাডাকি ক'রে সুরেনের পাত্তা পাই না। অনেকক্ষণ পরে দয়াপরবশ হয়ে কে যেন ডেকে দিলে। রাগ চড়ে উঠেছিল, বললাম—"কোথায় ছিলি রে হতভাগা? ডেকে মরে গেলে গ্রাহ্য নেই, যা—বেরো আমার বাড়ী থেকে।" শও

—"তাই দেন না বাবু দূর করে, হাড় ক'খানা জুড়োক আমানের।

—"ওঃ, খুব যে কথা শিখেছিস? যা দু'খানা লুচি ভেজে আর আলুমরিচ করে আন।" রে

হতাশার চরম ভঙ্গীতে দু'খানি হাত উল্টালো সুরেন। ক

—"কি রে?"

—"মাপ করতে হবে বাবু, রান্নাঘরের ছায়া দিয়ে হাঁটলে আপনার মাসীঠাকরুণ গোবরজল ছড়া দেন।

সুরেন নীচে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দাদার শালার উচ্চ চীৎকারে চমকে উঠি, "ব্যাটা রাস্কেল, সাপের পাঁচ পা দেখেছ তুমি? আধ ঘণ্টা আগে তোমায় সিগারেট আনতে দিয়েছি না? এখনো আড্ডা দিচ্ছ? স্টুপিড্ কাঁহাকা, চাবকে লাল করতে হয় তোমাকে, এ তোমার গোবরগণেশ মনিব পাওনি—আজই বিদেয় করছি তোমায়।"

একমিনিট পরেই মামাতো মেসোমশাইয়ের গলা—"আমাদের অমিয়র হয়েছে যেমন কিপ্‌টেমী, একটা মোটে চাকর। একটা চাকরে কখনো সংসার চলে? কোন্ কাজ ঠিক সময় হচ্ছে? কিছু না—কিছু না। আমি তো বাবা নিজের কাজ নিজেই করে নিচ্ছি। এখন মানে মানে যেতে পারলেই বাঁচি।"

কে যে মাথার দিব্যি দিয়ে বারণ করছে ঈশ্বর জানেন।

শিস দিতে দিতে ঘরে ঢুকলো নন্দলাল—"বেশ আছো অমিয় দা, বিনা পরিশ্রমে লাখ টাকার মালিক হয়ে তাকিয়ায় ঠ্যাং তুলে দিয়ে পড়ে আছো···'নো ভাবনা নো চিন্তা'—আর আমার? উঃ!"

হেসে ফেলি—"তোর কি এত ভাবনা?"

—"কটা বলবো? বন্ধুরা ধরে বসলো 'তোর দাদা লটারীতে টাকা পেলে আর খাওয়ালি না একদিন'—যেন নিজের সহোদর দাদা আমার! যত বলি—'দাদার এ্যাকসিডেন্ট্'—শোনে না, বলে, 'ওসব বাজে কথা, কঞ্জুস্ তাই বল্।' ঝোঁকের মাথায় প্রমিস্ করে

বসলাম, এখন কি যে করি? ছ'জনের সিনেমা আর রেষ্টুরেণ্টের খরচ—"

এত খোলাখুলি কথার পর টাকার বাক্স খুলব না, সত্যি তো এত কঞ্জুস নই!

"কলসীর জল" কোথায় গড়াচ্ছে কে জানে!

* * * *

সুরেন এসে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে পড়লো—"বাবু, হয় এর বিহিত করুন, নয় আমায় বিদেয় করুন।"

—"এই দুর্দ্দিনে তুইও আমায় ছেড়ে যাবি সুরেন?"

—"কি করবো বাবু, এই রাবণের সংসার পুষতে পারবো না আমি।"

—"তুই পুষছিস নাকি?" হেসে ফেলি।

—"না তো কি?" সুরেন খুব চটে ওঠে—"রাজশয্যেয় শুয়ে আছেন—কাজের মধ্যে একবার করে টাকায় সই করা—কত ধানে কত চাল হিসেব রাখেন? বাড়ীতে এদিকে রাজসুয় যজ্ঞি, দৈনিক তিরিশ কাপ্ চা, বারো টাকার মাছ, দশ সের করে আলু, ছ'টাকার পান সুপুরি, আরো কত বলবো! এছাড়া, মেসো বাবুর দাঁতে ব্যথা—ছ'বেলা খিচুড়ি হালুয়া, বৌদিদির 'এনিমি' না কি—নিত্য দিন ফল-মাখম, মাসীমা রাতে 'পাকদ্রব্যি' খান না—তেনার দই মিষ্টি ছানা, পিসিমার পিত্তির ধাত—ডাব নইলে চলে না, দাদাবাবুর পেটের দোষ—দই ভিন্ন খান না, বলতে গেলে মুখ ব্যথা। দিন পাঁচ সের দুধ নিচ্ছি তবু সব রাগারাগি!"

সেদিন পড়ে গিয়ে হাঁটু ভেঙে চোখে সরষে ফুল দেখেছিলাম— আজ আবার দেখলাম। এত খবর জানতাম না।

বললাম—"এখন উপায় ?"

—"উপায় তো হাতেই আছে—কিন্তু আপনার কি মন সরবে ? যা চক্ষুলজ্জা !"

—"কি বল্ তো ?" কৌতূহল হ'ল।

সুরেন হঠাৎ বীরবিক্রমে উঠে পড়ে ঘরের কোণ থেকে একটা জিনিস তুলে এনে উঁচিয়ে ধরে বিনা বাক্যব্যয়ে উপায় দেখিয়ে দিল।

জিনিসটি আর কিছুই নয়, বাবার আমলের একটি রূপো-বাঁধানো মোটা বেতের লাঠি।

কিন্তু সুরেনের উপায় তো সত্যি চালানো চলে না! কাজেই ছানা-চিনিই চলছে।

আর সুরেন বাজার করছে তো করছেই। লাক্স সাবান, নিমের মাজন, দ্রাক্ষারিষ্ট, সেফ্‌টি রেজার, লাল গামছা, তোলা উনুন, বোনার সূতো, টিনের মগ, সিগারেট, মোটা চিরুণী, পেতলের হাঁড়ি, লক্ষ্মীবিলাস—কি নয় ? আর কেনই বা নয় ? অসুবিধে সয়ে কে কতদিন থাকতে পারে ? আর আমার উপকার করতে এসে কি নিজেদের গাঁটের কড়ি খরচা করবেন ? বলতে গেলে—আমি যখন অর্দ্ধেক রাজত্বের মালিক !

সুরেন আর রাগ করে না—বরং পাঁচ টাকার জায়গায় সাত টাকা খরচ করে আসে—খুব সম্ভব আমার উপর আক্রোশে। নাঃ, আর সহ্য করা অসম্ভব! সুরেনের মর্ম্মব্যথাই আমাকে

জাগিয়ে তুললো। ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে পড়ে, লুকিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কারুর সামনে দিয়ে এলে তো রক্ষে নেই, হিতৈষীর দল 'হাঁ হাঁ' করে আসবেন।

বেরিয়ে গাড়ীখানায় চড়বো বলে গেলাম গ্যারেজে, শুনলাম—গাড়ী চড়ে দাদাবাবু—অর্থাৎ দাদার শালা—অফিসে গেছেন। তাই যান রোজ।

বিনা বাক্যব্যয়ে একখানা ট্যাক্সি নিলাম।

প্রথমে গেলাম ভাবী অফিসে, জানলাম 'জয়েনিং ডেটের' আর পাঁচ দিন বাকী আছে। অতঃপর একে একে দশবারোটা খবরের কাগজের অফিসে—ইংরিজি বাংলা হিন্দি যতগুলো নাম-জাদা কাগজ আছে।

শেষ মাথায় ট্যাক্সিখানা করেই সোজা চলে গেলাম দক্ষিণেশ্বরে এক বন্ধুর বাড়ী।···তারপর? বন্ধুর বাড়ী পোলাও কালিয়া। তারপর? সন্ধ্যাবেলা গঙ্গার ধারে বেড়ালাম—কালীবাড়ীর আরতি দেখলাম। এভাবে দু'দিন কাটল।

তারপর? নাঃ, সবটা না শুনে আর ছাড়বে না দেখছি।

তৃতীয় দিন সকালবেলা মা কালীকে এক পেন্নাম ঠুকে ফিরে এলাম। দেখি সদর দরজা খোলা—সুরেন 'ফ্যাল্‌কা-মুখো' হয়ে বসে আছে রোয়াকে।

—"বাবু এসেছেন?"—একটি শব্দে সুরেন করলো তার সমস্ত ভাবের অভিব্যক্তি—সুখ-দুঃখ, ভয়-ভাবনা, হর্ষ-বিষাদ। পর্শু থেকে আমার অনুপস্থিতিতে ভেবেছিলো বোধ হয় এবার আর হাঁটুর ওপর দিয়ে যায়নি, মাথার খুলিটাই গেছে।

—"বাবু, এঁরা সব পগার পার।"

—"জানি।"

—"কাল সারাদিন সে কী কাণ্ড বাবু!"

—"জানি।"

—"লোকের ওপর লোক আসছে—একটুকরো খবরের কাগজ হাতে—দলে দলে কাতারে কাতারে, সে যে কী ব্যাপার—বললে বিশ্বেস করবেন না বাবু, আর বলবেই বা কে মুখ ফুটে? সে এক ভয়ঙ্করী দৃশ্য!"

—"জানি।"

সুরেন কিছুক্ষণ আমার দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে গম্ভীরভাবে বললে—"এতই যদি জানতেন বাবু, তবে আর টাকার খাতাটা শেষ করে আনলেন কেন? আগে জানলেই পারতেন!"

লোকগুলো সুরেনের ভাষায় যে খবরের কাগজের টুকরোগুলো এনেছিল—সে আর কিছুই নয়, একটা বিজ্ঞাপনের কাটিং।

আমারই বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে—নীচে লেখা আছে—

বস্ত্র বিতরণ! বস্ত্র বিতরণ!!

কেবলমাত্র একদিনের জন্য!

১০০০খানি ধুতি সরকার-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছে।

যথার্থ বস্ত্রাভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণ উপযুক্ত প্রমাণ সহ

উপরোক্ত ঠিকানায় আবেদন করুন!

ব্যস! বেলা দশটা থেকে, দলে দলে, পালে পালে, কাতারে কাতারে আবেদনকারী "উপযুক্ত প্রমাণ সহ" "কাপড়া কাপড়া" "ধোতি ধোতি" শব্দে 'রে রে' করে ছুটে এসে বস্ত্র বিতরণের চিহ্নমাত্র না দেখে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে আরম্ভ করে দেয়। পরের কথা সংক্ষিপ্ত···সেই "যথার্থ অভাবগ্রস্তদের" মূর্ত্তি দেখেই আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল সকলের—তার ওপর ইট-পাটকেল !!

সত্যি তো আর এতগুলো উন্মাদ সামলানো আমার সেই ভালোমানুষ গোবেচারাক্লাশের খুড়তুতো মাসীমা, মাসতুতো পিসিমা, পিসতুতো মামীমা, মামাতো মেসো মশাই, জ্যেঠতুতো দাদার শালা, আর জ্ঞাতি বৌদিদির পক্ষে সম্ভব নয় !

তাই খিড়কির দরজা দিয়ে একবস্ত্রে প্রস্থান।

সুরেন অনেক কষ্টে তিনতলার ছাদে উঠে আত্মরক্ষা করেছে।

সার্শির কাঁচগুলো অবিশ্যি একখানাও আস্ত নেই, না থাক্—ও তো বাড়ীওয়ালার।

বাদলের কীর্তি

—ডাক্তার কি বলে গেল ছোট্‌কা ?

সশব্দ প্রবেশের সঙ্গে নিজেকে সজোরে একটা চেয়ারে নিক্ষেপ ক'রে বাদলবাবু উক্ত প্রশ্নটি করে হাঁফাতে থাকেন।

ত্রস্তব্যস্তে নিজেকে এবং টেবিলের জিনিসগুলোকে সামলে কতকটা নিরাপদ করে নিতে হয়। কারণ বাদল ঘরে ঢুকলেই একটা তচ নচ্‌ কাণ্ড অবশ্যম্ভাবী।

ধীরে সুস্থে বলি—ডাক্তার বলে গেল—রোগ যদি কোথাও হয়েই থাকে—সে তোমার ব্রেণে।

—তার মানে—আমার মাথা খারাপ, কেমন? এই তো বলছো?

—আমি তো কিছুই বলিনি বাপু, ডাক্তারের মত জানতে চাইছো তাই বলছি।

—জানি জানি, সব বুঝেছি, বন্ধু ডাক্তার—সে তো তোমার দিকে ঝোল টানবেই। আর বিনি ভিজিটের ডাক্তার রুগীর মাথা খারাপ ছাড়া আর কি বলবে বল? নিত্যি নিত্যি বেগার খাটতে আসতে কার সখ হয়? হ্যাঁ হ'তো যদি ষোল টাকার ডাক্তার, কেমন না রোগ খুঁজে বার করতো দেখতাম। এই যে কথা কইলেই হাঁফাচ্ছি এটা বুঝি খুব ভাল লক্ষণ?

চেষ্টা করে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে থাকে বাদল—যাতে দুর্লক্ষণটা বেশ জোরালো হয়।

কেন জানি না, কিছুদিন থেকে বাদল আমাকে বিশ্বাস করাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে—তার স্বাস্থ্যের অবস্থা অতীব শোচনীয়, এইবেলা চেঞ্জে না গেলে নাকি বিপদ অনিবার্য্য। কে যে ওর মাথায় ঢুকিয়েছে!

ওর মনটাকে প্রবোধ দেবার জন্যে ডাক্তার বন্ধু প্রতুলকে একবার ডেকেছিলাম। কিন্তু তার রায়টা দেখছি বাদলের মনঃপূত হ'ল না।

কলকাতার হাওয়ায় নাকি সর্ব্বদা রোগের জার্ম্ম ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাদলের মত নিরীহ ছেলেদের আক্রমণ করতে। মাঝে

মাঝে একবার বাইরে গিয়ে 'মুক্তবায়ু ভক্ষণ' করে আসা ছাড়া বেঁচে থাকবার আর কোনো উপায় নেই।

কি জানি—ছেলেটা তলে তলে কবিতা ফবিতাই লিখছে না কি, হয়তো কলকাতার নীরেট আবহাওয়ায় কলমটা ঠিক খুলছে না, কিছু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দরকার হ'য়ে পড়েছে। ... ...

আমাকে নিরুত্তর দেখে বাদল টেবিল থেকে পেন্সিলটা তুলে নিয়ে চিবোতে চিবোতে বলে—অবিশ্যি না নিয়ে যাও সে আলাদা কথা, আমি বাঁচলেই বা কি মরলেই বা কি, তুচ্ছ একটা বাদল বৈ তো নয়। তবে পাড়ার লোকে তোমাদের দূষবে, এই আর কি! এই তো সেদিন ছোট পিসির শ্বশুর বলছিলেন—

—ছোট পিসির শ্বশুর? স্বর্গ থেকে রেডিওযোগে কিছু বলছিলেন বুঝি?

—আঃ হ'ল না হয় শ্বাশুড়ীই—বাদল নিতান্তই যেন আহত হয়—অত কি মনে থাকে? শরীর খারাপ থাকলে মেমারিও নষ্ট হয়।...সে যাক্। আমার রোগটা তো সবই কাল্পনিক—তবে ছোট পিসির ইয়ে সেদিন বলছিলেন কিনা—যে, 'বাদল দিন দিন কী রোগাই হয়ে যাচ্ছো তুমি, দেখলে চেনা যায় না—' তাই বলছি আমার ভালো-মন্দ একটা কিছু হলে পাঁচজনে তো তোমাদেরই নিন্দে করবে! এই জন্যেই বলা।

মুখের ভাবে যতদূর বৈরাগ্য আনা সম্ভব তা' এনে বাদল বাইরের দিকে চেয়ে বসে থাকে।

নাঃ, ছেলেটা দেখছি রোগ না এনে ছাড়বে না।

বলি—আচ্ছা বাপু, খুব রোগ হয়েছে তোর স্বীকার করছি, কিন্তু

চেঞ্জে যাওয়া বললেই তো হয় না? কত ব্যবস্থা কত হ্যাঙ্গামা। ধর—শিলং কি সিমলে, পুরী কি পুরন্দরপুর, সেইটা সিলেক্ট করাই তো এক প্রব্লেম। তারপর দিনক্ষণ, পাঁজীপুঁথি—হুট্ বলতেই তো ছেড়ে দেবেন না মা।

বাদল বৈরাগ্য ভঙ্গ করে একটু নড়ে চড়ে বসে, বোধ হয়—একটু আশার বাণী শুনে। বলে—অত বাবুয়ানার দরকার কি ছোট্কা? শিলং সিমলে ওসব বড়লোকের জায়গা, হাতের কাছে নিজেদের দেশ রয়েছে সিউড়ি, পৈত্রিক ভিটে—

পৈত্রিক ভিটের ওপর বাদলের ভক্তির বহর দেখে না হেসে পারিনে।

বললাম—কিন্তু সিউড়ি কি একটা হাওয়া বদলাবার দেশ রে ?

—ওই তো দোষ ছোট্কা, বাঙালী তো ওতেই উচ্ছন্ন গেল, নিজের দেশের ওপর অছেদ্দা ক'রে। এই তো—বঙ্কিমচন্দ্র না মাইকেল কে যেন—'বিদেশের ঠাকুর আর স্বদেশের কুকুর' নিয়ে লিখে যান নি কি? না মানলে আর কি হবে—

বাস্তবিক বাদলের স্মৃতিশক্তির তারিফ না ক'রে উপায় নেই।

যাক্ কথাটা কিন্তু মন্দ বলে নি নেহাৎ। মাও প্রায়ই দেশের বাড়ীর ভগ্নদশার কথা তুলে খেদ করেন, আমারও কিছু ছুটি পাওনা হয়েছে। বললাম—আচ্ছা তাতে যদি তোর সত্যিই কিছু উপকার হয়, চল্ দিনকতক। পাঁজীপুঁথির ব্যবস্থা নিগে ঠাকুমার কাছে।

—ওর আর কি—ভট্চায্যি মশাইয়ের কাছে একবার...আরে আরে ওই তো ভট্চায্ মশাই যাচ্ছেন না?

বলেই—হঠাৎ চেয়ারটা উল্টে টেবিলটায় ধাক্কা মেরে কপাটটা ঝনাৎ করে খুলে ঠিক্‌রে গিয়ে রাস্তায় পড়লো বাদল।

এতে অবশ্য বেশী আশ্চর্য্য হই না আমি। এইটাই বাদলের স্বাভাবিক গতি।

এক পেয়ালা চা গেল তাতেও দুঃখ ছিল না, কিন্তু দামী পোর্সিলেনের পেয়ালাটা টেবিল থেকে পড়ে গুঁড়ো হয়ে গেল এই যা—প্রাক্-যুদ্ধকালের জিনিস তাই, তা নইলে এ বাজারে পাঁচ টাকা দিলেও মিলবে না এমন পেয়ালা।

মিনিট খানেক পরেই বাদল ফিরে এল—ওঃ, চোখটা ছোট্‌কা কী খারাপই হয়ে গেছে, আর তুমি বল কিনা চশমা নিতে হবে না? হেল্‌থ্‌ খারাপ হ'লেই 'অপটিক্ নার্ভ' উইক হ'য়ে পড়ে, এ তো কচি ছেলেরাও জানে। চোখের মাথাটা একেবারে না খেলে আর তোমাদের—এই দেখ একটা মোছলমান বিড়িওলাকে ভট্‌চায্‌ মশাই বলে ভুল করে ছুটলাম!···কিন্তু একি—পেয়ালাটা ভাঙলে ছোট্‌কা? বড্ড কিন্তু অসাবধান হচ্ছ বাপু আজকাল, আহা-হা এমন জিনিসটা—

ভাঙা কাঁচের টুকরো একটা তুলে নিয়ে করুণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে বাদল।

নাঃ রাগিয়ে না দিয়ে ছাড়লো না দেখছি—বলি, জ্যান্ত মাছে পোকা পড়াসনে বাদল, দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ছুটলি, মনে নেই? কি পড়লো কি ভাঙলো খেয়াল থাকে কিছু? এমন জিনিসটা—

—তাই বুঝি? আমারই ধাক্কায়?

চট্ করে ভাঙা কাঁচটুকু ফেলে দিয়ে বাদল মুখে একটা উদার ভাব এনে ফেলে—ওঃ. ওর জন্যে মন খারাপ কোরো না ছোট্‌কা কাঁচ ক্ষণভঙ্গুর জিনিস কে না জানে? আজ নয় কাল, যেতই একদিন, বরং আর এক কাপ্ চা আমি তোমার—

* * *

চায়ের সঙ্গে কোথা থেকে চারটি ডালমুটও এনে হাজির করে ফেলে।

মানে—তোয়াজ সুরু হ'ল, কাজ আদায় করতে বাদলের এ একটি বিশেষ 'চাল'।

শেষ পর্য্যন্ত বহুদিন পরিত্যক্ত পৈত্রিক ভিটেরই ভাগ্যি ফেরে। একদিন পোঁটলা-পুঁটলী বেঁধে সিউড়ি রওনা হই। মা, আমি, বাদল, আর হারাধন। বাদলের দক্ষিণ হস্ত হ'ল এই হারাধন।

মরচে-ধরা তালা-চাবি খুলে যখন আধ-ঝুলন্ত কড়ি-বরগা, উই-ধরা জানলা-দরজা, আর ফাটলে গজানো মহীরুহদের মনোহর মূর্ত্তি দেখে আমি কাতর, আর মা ক্রুদ্ধ, তখন দেখি বাদল আর হারাধন মহোৎসাহে উঠোনের জঙ্গল ঠেঙাতে সুরু করেছে।

—অ বাদলা, অ মুখপোড়া, ও কি হচ্ছে আমার মাথা খেতে? হেরো হতচ্ছাড়া, দিচ্ছিস তো কুমন্ত্রণা? তখনই বলেছিলাম—ও শয়তানকে এনে কাজ নেই। এখন দেখ্ নেপু, ছোঁড়া দু'টোর কাণ্ড!

বলা বাহুল্য এটি আমার 'মাতৃভাষা'। সচরাচর বাদল সম্বন্ধে এই রকম ভাষাই ব্যবহার করে থাকেন মা।

বাদল কিছু বলে না, হারাধন গম্ভীরভাবে বলে—সাপ তাড়াচ্ছি

গো ঠাক্‌মা, বাস করতে হবেক তো? যা জঙ্গল এঃ—বাঘ লুকিয়ে থাকে তো সাপ!

আমার আর বাদলের দু'টো ছাতাই প্রায় ফিনিশ্‌ করে আনে তা'রা আগাছা ঠেঙিয়ে।

ক'টা মিস্ত্রী, ক' হাজার টাকা, আর কতটা টাইম হ'লে বাড়ী-খানা বসবাসের যোগ্য করা যায় মনে মনে তারই একটা এষ্টিমেট্‌ কষছি—হঠাৎ শুনলাম—বাদলের চাপা অথচ পুলকিত কণ্ঠস্বর—ঠিক এই রকমটিই দরকার বুঝলি হারু, চকচকে ঝকঝকে জায়গায় তাঁরা আসেন কখনো? কক্‌খনো না, তাহলে আর কলকাতা কি দোষ করেছে? গেলেই হয়? তা নয় রে, এই সব পুরনো পুরনো ভ্যাপ্‌সা গন্ধ, আর গাছপালার বুনো গন্ধ, এটাই ওঁদের পছন্দ। সত্যি, এ্যাটমোস্‌ফিয়ারটা চমৎকার! উঃ কম কষ্টে কি রাজী করাতে হয়েছে!··কে ও ছোট্‌কা নাকি? চা টা খেয়েছ তো? বাস্তবিক 'জল-হাওয়া' বেশ ভাল এদিককার। কী দারুণ ক্ষিদেটাই পাচ্ছে—তোমার পাচ্ছে না ছোট্‌কা?

—হ্যাঁ নিদারুণ একেবারে, কিন্তু 'ওঁরা' 'তাঁরা' আবার কারা শুনি? আবার কাকে জোটানো হচ্ছে এই ইন্দ্রপুরীতে?

বাদলকে বিশ্বাস নেই, একবার দেওঘর গিয়েছিলাম বাদলকে নিয়ে। ষ্টেশনে এসে দেখি ওনার তিনটি বন্ধু উপস্থিত। তাঁরাও যাবেন, বাদলের নেমন্তন্ন।

বাদল অভয় দেয়—সে সব কিছু নয় কাকা। ও নিয়ে মাথা ঘামিও না তুমি। ও আমাদের গোপনীয় কথা। চলরে হেরো, ঠাকুরমার খিচুড়ি নামলো বোধ হয়।...ছোট্‌কা আসবে নাকি?

খিচুড়ি, পাঁপর ভাজা, আর আলুসিদ্ধ—এই মাত্র। বাড়ী হ'লে বাদল রসাতল করে ছাড়তো, কিন্তু আজ স্ফূর্ত্তি দেখে কে! চেয়েই নিল দু'বার। জল-হাওয়ার গুণ তা'হলে মিথ্যে নয় দেখছি।

হঠাৎ বলে ওঠে—আচ্ছা ঠাকুমা, কাছাকাছি শ্মশান আছে তো?

মা চমকে উঠে আরো দু'খানা পাঁপর ভাজাই দিয়ে ফেলেন।

—ও আবার কি কথার ঢং রে বাদলা? শ্মশান কি হবে শুনি?

—না এমনি বলছি—নিজেদের দেশে কোথায় কি আছে খবর নেব না?

—তাই সর্ব্বাগ্রে শ্মশানের খোঁজ? বুদ্ধির বালাই নিয়ে মরে যাই। কেন রাতারাতি বুড়িকে শ্মশানে রেখে আসার মতলব হচ্ছে নাকি? তা তোমরা পারো, হেরো আর তুমি দু'টিকে একত্র দেখলে আমার বুক কাঁপে। সব পারো তোমরা। নেপুর যেমন কাণ্ড, তাই তোদের এনেছে এই 'বনোলা পুরীতে'।

কার 'অনারে' কে এসেছে সেটা আর মনে নেই মার।

হারু পাতটি চেটেপুটে হৃষ্টচিত্তে বলে—দাদাবাবুর কথা শোনো কেন ঠাকুমা, ওনার কি 'বুদ্ধির' ঠিক আছে? কেতাব পড়ে পড়ে মাথা গরম হয়ে গেছে।

ভেবেছিলাম—ছুটির দিন ক'টা আরামে কাটাবো। কপালে নেই—ছুতোর, কামার আর রাজমজুরের ধাক্কায় ঘুরে মরছি।

দশ-বিশ বছর ফেলে রেখে দেওয়া বাড়ী অবহেলার শোধ নিচ্ছে।

এদিকে বাদল যে কিসের ধান্ধায় আছে বাদলই জানে। আমি শুধু তার নিত্য নূতন অভাব-অভিযোগের অভাবেই মাঝে মাঝে আশ্চর্য্য হয়ে যাই। খাওয়া নিয়ে বায়না নেই বাদলের—ব্যাপার কি?···দু'একদিন থেকেই সখ মিটে যাবে ভেবেছিলাম—তারও লক্ষণ দেখি না।

একদিন মাকে জিজ্ঞেস করলাম—বাদলার টিকিটাও দেখি না মা, কোথায় ঘোরে চব্বিশ ঘণ্টা? এই পাড়াগাঁয়ের হাওয়া আর রোদে চেহারা খুলে যাবে একেবারে। হারুটাই বা কই?

মা দুই হাত উল্টে উদাস ভঙ্গীতে বলেন—আ আমার কপাল, বেড়ায় আবার কোথা? উদয়াস্ত তো সেই চিলে-কোঠার ঘরে। কি যে করে সেখানে ওই জানে, আর ওর পেয়ারের হারাধন জানে। আমাকে তো ছাতের ত্রিসীমানায় যেতে দেবে না। ওই ছোঁড়াকে পাহারা রেখে দিয়েছে।

শুনে তো অবাক। ঘরে খিল দিয়ে কবিতা লেখাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তো এত কাণ্ড করে কলকাতা ছাড়বার দরকার কি? সেখানে তো দু'খানা ঘর খালি পড়ে ছিল তিনতলায়। বনজঙ্গল আঁদাড়-পাঁদাড় এত সব থাকতে—চিলে-কোঠা?

বোমা টোমা নয় তো? কি জানি—এখনকার ছেলেদের বিশ্বাস নেই বাবা।

—'বাদল বাদল'—হাঁক পাড়তে নেমে এল। এসে বলল—কী ছোট্‌কা বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে নাকি? তোমাদের

জ্বালায় সুস্থির হয়ে একটু—ইয়ে—লেখাপড়া করবার জো নেই।······

গ্রীষ্মের ছুটিতে লেখাপড়ার ওপর এত অনুরাগ, এ তো ঠিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ মনে হচ্ছে না। উঁহু, সত্যিই কিছু হ'ল নাকি বাদলের? ডিস্‌পেপসিয়া? তা'ছাড়া লেখাপড়াতে লুকোচুরির কি আছে? সেই সন্দেহই ব্যক্ত করি—পড়িস্‌, বেশ তো ভালো কথাই। কিন্তু পাহারা বসিয়ে পড়া—সেটা কি রকম বাপু? মাকে ছাদে উঠতে দাও না—

বাদল কথা কয় না, উত্তর করে ওঠে অনুচরটি—ও কথাটি বলবেন না ছোটবাবু, সাক্ষেৎ আপনার গভ্যধারিণী মা তাই বলতে ভয় লাগে, নইলে—উটি একটি 'টিক্‌টিকি'। দাদাবাবু বলে—নিজ্জন নইলে সাধনা হয় না—আর ঠাক্‌মা পঞ্চাশবার উঁকি দিচ্ছে।

মা সামনে ছিলেন না, তাই হারাধনের এত সাহস। হঠাৎ ভাঁড়ার ঘর থেকে মা যখন এসে পড়লেন, হারাধনের মুখ আর অঙ্গভঙ্গী তখন থেমে গেল।

এতদিন লক্ষ্য ছিল না, একটু চোখ রাখতেই নজর পড়লো—বাদল আর হারাধন যেন কী এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, সর্ব্বদাই ফিস্‌ফাস্‌ কথা, চোখে চোখে ইসারা, কী যেন এক ব্যস্তভাব!

ছ'শো বার তিনতলা একতলা করতে করতে হারাধনের তো পায়ের সুতো ছিঁড়ে যাবার কথা। নেহাৎ তার পরমারাধ্য দাদাবাবুর ফরমাস খাটা ব'লেই বোধ করি অটুট আছে।

ঘুম থেকে উঠেছি, আর মার বিরক্তস্বর কানে এল—কিছু খাবি না মানে? নির্জ্জলা উপোস দিবি তুই? কেন ঘাড়ে কি চেপেছে?

এই তো আজ তিনদিন ধরে নিরিমিষ্যি খাচ্ছিস তাতে হ'ল না? দরকার নেই আমার। নেপু আজই তোকে কলকাতার গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসুক। মা-বাপের কাছে গিয়ে যা খুসী করগে যা।

নাঃ বাদল যে ক্রমশঃই রহস্যময় হয়ে উঠছে। উপবাস? নিরামিষ? গুরুটুরু জোটালে নাকি দেশে এসে? জিজ্ঞেস করলে তো বলেও না ভালো করে।

এদিকে মারও হয়েছে জ্বালা। একে তো বাদলের উপদ্রব, তার ওপর তেমনি হয়েছে ইঁদুরের উৎপাত। বড় বড় মেঠো ইঁদুর—ওদের অসাধ্য কর্ম্ম কিছু নেই। এই তো সেদিন মার রুদ্রাক্ষর মালাগাছটা টেনে নিয়ে কোন্ গর্ত্তে যে ঢোকাল, তার আর পাত্তাই পাওয়া গেল না। একদিন চন্দন কাঠের টুক্রো হু'খানা নিয়েই ভেগেছে। মট্‌কার থানখানাও শুনছি হু'দিন ধরে পাওয়া যাচ্ছে না। এও নিশ্চয় ওদেরই কর্ম্ম। চোর-ছ্যাঁচোড় আসবে কোথা থেকে?

আজ আবার শুনেছি ঠাকুরঘরে ধূনো দেবার বড় পেতলের ধুনুচিটা, আর গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা। কেটে কুটেই ছোট করুক না হয়, কিন্তু আস্ত পঞ্জিকাখানা? তা' ছাড়া পিতলের ধুনুচি? সত্যি, কি জাতের ইঁদুর সে? ইঁদুরের বামুন নয় তো? যেমন ধোবার বামুন, গয়লার বামুন—তেমনি?

মা রেগে টেগে এসে বললেন—আর দরকার নেই নেপু, আজই চল। খুব দেশের বাড়ী ভোগ হয়েছে, ভোগ নয় ভোগান্তি! বাবার কালে এমন ইঁদুর দেখিনি। ওমা কী কাণ্ড! আচ্ছা— পেতলের ধুনুচি যে নিলি—দাঁতে কাটতে পারবি? কাগজ খাবার

সখ হয়েছে—কত কাগজ আছে খা না—তা নয়, "পাঁজী খাবো"। এখন—আমাবস্যে আজ না কাল—কি করে বুঝবো?

বললাম—আমাবস্যে আজই, ক্যালেণ্ডারে রয়েছে, কিন্তু এও তো আশ্চর্য্য যে বেছে বেছে পূজো-আর্চ্চার জিনিসগুলোই খাচ্ছে ইঁদুরে! সত্যি খুবই সাত্ত্বিক ইঁদুর তা'তে আর সন্দেহ নেই। প্রথম নম্বর—রুদ্রাক্ষর মালা, নম্বর টু চন্দন কাঠ, নম্বর থ্রি মট্‌কার থান, চার নম্বর এই পঞ্জিকা আর ধূনুচি, কেন বলতো?

—আমার সঙ্গে বিশ্বশুদ্ধ সকলের শত্তুরতাই, আর কেন?—ব'লে মা বিশ্বশুদ্ধ সকলের উপরই রাগে গন্‌গন্ করতে থাকেন।

আমার কিন্তু কেমন সন্দেহ হচ্ছে। বাদলের রহস্যময় গতিবিধির সঙ্গে এই সব অন্তর্দ্ধানের কোন যোগসূত্র নেই তো? ওর চিলে-কোঠার ঘরটা একবার সার্চ্চ করলে হয় না?

মাও বোধ করি তলে তলে ঐ মতলব করছিলেন। রাত তখন এগারটা—শুয়েছি, কিন্তু গরমের জ্বালায় ঘুম হচ্ছে না। হঠাৎ মা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে উঠলেন—ও নেপু, দেখ্ বাদলার কীর্ত্তি! ওমা আমি কোথায় যাবো—গলায় দড়ি দেবো না বিষ খাবো! কী সর্ব্বনেশে ছেলে গো, মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে যে গো—

শুয়ে থাকা অসম্ভব হ'ল। দড়ি এবং বিষ দু'টো মোক্ষম জিনিসেও যখন মার মন উঠছে না, মরবার আরো পথ খুঁজছেন, তখন ব্যাপারটা একটু যেন বেশীই ঘোরালো।

উঠে পড়ে ব্যস্ত হয়ে বলি—কি গো মা, হ'ল কি ?

—হ'ল আমার মাথা আর মুণ্ডু। এই ঘোর আমাবস্যের রাত্তিরে পথের পানে চাইলে গায়ে কাঁটা দেয়, আর সেই লক্ষ্মীছাড়া ডাকাত ছেলে কিনা শ্মশানে গেছে 'ভূতসেদ্ধ' করতে। আমি এই বলে রাখছি নেপু, তোমাদের ও ছেলে একদিন খুনে হবে।

—খুনে হবে সে তো বুঝলাম, কিন্তু 'ভূতসেদ্ধ' কি ?

—জানি না। জিজ্ঞেস কর ওই হেরো মুখপোড়াকে—কুমন্ত্রণার গুরু যেটি।

অগত্যা হেরোর শরণ নিতেই হ'ল। হাঁক দিতেই সাদা বাংলায় যাকে 'কাঁচুমাচু' বলে, তদবস্থায় এসে দাঁড়ালো হারাধন। কিন্তু কথার উত্তর কি সহজে দিতে চায়!

জেরার ফলে যা গোচরীভূত হ'ল, সেটা লোমহর্ষক বটে। একপক্ষকাল সজোর সাধনার পর, অমাবস্যার দিন স্রেফ নির্জ্জলা উপবাস করে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে শ্মশানে গিয়ে ধূনি জ্বালিয়ে একাসনে বসে এক হাজার জপ করতে পারলেই নাকি ব্যস! —ভূতসিদ্ধ প্রেতসিদ্ধ বা ডাকিনী-যোগিনীসিদ্ধ তো কোন ছার, একেবারে সুসিদ্ধ বাদল!

আরো এক ফ্যাসাদ—শনিবার সম্বলিত অমাবস্যা হওয়া চাই এবং আজই হয়েছে সেই মণিকাঞ্চন যোগ!

শুনে প্রায় রুদ্ধবাক্ হয়েছিলাম, অনেক কষ্টে বলি—সাধনাটা কি রকম ?

বিকশিত-দন্ত হারাধন সাহসে ভর ক'রে বলে—এজ্ঞে সেই

কেতাবের ছবির মতন কায়দা করে ব'সে "মণিপদ্ম হুম্" জপ করতে হয়।

ক্ষণে ক্ষণে যেন বিদ্যুতের শক্ খাচ্ছি। বলি—কেতাব আবার কি? কই দেখি।

অনিচ্ছামন্থরগতিতে, হ্যারিকেনের শিখাটা চরম সীমায় টেনে নিয়ে হারু তিনতলার চিলেকোঠা থেকে একখানি ছেঁড়া ঝরঝরে বই এনে আমার হাতে সমর্পণ করে।

বটতলার ছাপা ও অগ্রপশ্চাৎবিহীনা একখানা "প্রেতসিদ্ধি বা তন্ত্রমন্ত্র-শিক্ষা"। নামও শুনিনি কখনো এসব উনচুটে বইয়ের।

'আসন' 'প্রাণায়াম' ইত্যাদির শিক্ষা বাবদ কয়েকখানি ছবিও ছাপা আছে। যদিও ছবি দেখলে, বাঁদর কলা খাচ্ছে কি ধ্যানমগ্ন সিদ্ধপুরুষ এটা বোঝা শক্ত, তবু—অনুষ্ঠানের ক্রুটি নেই।

মার অন্তর্হিত মটকাখানি ভাঁজ করে 'আসনের' কাজ চালানো হচ্ছে। অতএব···রুদ্রাক্ষর মালা, চন্দনকাঠ, আর পঞ্জিকা প্রভৃতির হদিস্ পাওয়া যাচ্ছে।

ঘর সার্চ্চ করবার সময় হ'ল না। লাঠি, লণ্ঠন আর হারাধনকে ভরসা করে এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে শ্মশানের উদ্দেশ্যে পা বাড়াই। বাদল 'ভূতসিদ্ধ' করবে, কি ভূতেই তাকে সিদ্ধ করে খেলে, কে জানে?

সারাপথ হারুর আবেদন-নিবেদন—হেই ছোটবাবু, তোমার পায়ে ধরি, আমার নামটি কোরো না। দাদাবাবু তা'হলে 'এহ্-জন্মে' আমার মুখ দেখবে না।...হেই ছোটবাবু, মরে গেলে

কুমীরপাকের নরক হবে আমার। দা'বাবু বলে, 'বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি কুকুরের অধম'।

. হারুর প্রভুভক্তির প্রশংসা না করে পারি না। এ হিসেবে কুকুরাধম না বলে বরং কুকুরোত্তম বলা উচিত তাকে।

দিনের বেলা দেখেছি—শ্মশানটা আমাদের বাড়ী থেকে আধ মাইলটাক দূরে। কিন্তু এই গভীর অন্ধকারে প্রতিমুহূর্ত্তে সাপ আর বাঘের মূর্ত্তি কল্পনা করতে করতে সেই আধমাইল পথই যেন আধযোজন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন তেপান্তরের মাঠ পার হচ্ছি।

—হেরো—কি হ'ল বাপ, কোথায় তোর দা'বাবু—আর তার 'ভৈরবী পীঠ'? রাস্তা হারালি না তো?

—না ছোটবাবু, উই যে—হোথায়—উই পেরকাণ্ড গাছটার নীচে দিনমানে দেখে গেছি যে—এখন আঁধারে ঠাওর হচ্ছে না। রসুন—হাঁক ছাড়ি—দাদাবাবু উ—উ—উ—ও দাদাবাবু—উ—উ!

হারুর চীৎকার থামবার সঙ্গে সঙ্গেই কাছাকাছি কোথাও থেকে বাদলের আবেগকম্পিত ভাঙাভাঙা স্বর ভেসে এল—হারু! এসেছি—স্? আমি এখা—নে—এ—এ। এত দেরী কেনো—ও? আলো এনেছিস বুঝি?

দূরবর্ত্তী বাদলের সু-উচ্চ কণ্ঠস্বরে আনন্দের যে উচ্ছ্বাস ধ্বনিত হ'ল তাতে মনে করা যায়—যেন ঘোর দুঃসময়ে তার ত্রাণকর্ত্তার দেখা পেয়েছে। যাই হোক সজ্ঞানে যে পাওয়া গেছে এই ভাগ্যি। ভেবেছিলাম—হয়তো বা স্থান-মাহাত্ম্যে মূর্চ্ছাটুর্চ্ছা হয়েই পড়ে

আছে। আমারই তো ভয়ে গা ছম্‌ছম্‌ করছে। কিন্তু একালের ছেলে ভাঙে তো মচকায় না—

—কী হে অবধূত বাবা?—ব'লে মুখের কাছে হ্যারিকেনটা তুলে ধরতেই বাদল চমকে উঠলো। তারপরই আমার আবির্ভাবের কারণ অনুমান করে চাপা গর্জ্জন করে উঠলো—হেরো—শয়তান, বিশ্বাসঘাতক, স্পাই!

গলায় রুদ্রাক্ষর মালা, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, পরিধানে একখানি লালরঙের বিলিতি কম্বল। সামনে নির্ব্বাপিত-অগ্নি ধুনুচি, আর—বিশ্বাস করবে কি না জানি না—একখানা মড়ার মাথার খুলি। যোগাসনাসীন বাদলকে দেখে হাসবো কি কাঁদবো ভেবে পাইনে।

এই—মশার কামড়, পেঁচার ডাক, শেয়ালের চীৎকার এবং অমাবস্যার রাত্রির ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে বাদলের মত অস্থির ছেলে বসে আছে কি করে এই আশ্চর্য্য!

খেয়ালের বাহাদুরী আছে। কিন্তু উঠে আসতে কি চায়? অনেক কষ্টে যখন গ্রেপ্তার করে আনলাম তখন রাত্রি প্রায় শেষ হয় হয়।

পথে আসতে আসতে হারাধন একবার করুণ মিনতির সঙ্গে বলে—আর কতটা বাকী ছিল দাদাবাবু? আধসিদ্ধ হ'য়ে এসেছিল?

—থাম্‌ ষ্টুপিড্‌। তোকে জানানোই ভুল হয়েছিল আমার। আর ওই হতচ্ছাড়া ধুনুচিটা—যতই জ্বালাতে যাই নিবে বসে থাকে। দু'শো জপ হয়ে গেল, আর আটশো বার হলেই হ'য়ে

যেত। কিছুতে হ'ল না। "হুং হুং হৌং হৌং বষট্" ব্যস এই তো—

আমি অল্প হেসে বলে ফেলেছি—মাত্র আটশো বাকী? তবে তো সবই হয়ে গেছে। বাকীটুকু বাড়ী গিয়ে—

আর যায় কোথা, ইংরিজিতে যাকে বলে 'বার্ষ্ট' করা!

—যাও যাও, আর সাউখুড়ি কোরো না ছোট্‌কা। বেশ কুম্ভীপাক নরকে পচে মরবে। আমার কি? সাধনায় বিঘ্ন করা মহাপাতক তা জানো? কত ষড়যন্ত্র—কত কাণ্ডকারখানা করে এত যোগাযোগ করলাম, সব পণ্ড হ'ল! একবার ভূতসিদ্ধ হ'তে পারলে 'শূন্যে ভ্রমণ', 'পাতাল পরিভ্রমণ', 'অদৃশ্য হওন' প্রভৃতি কী যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড সব হ'তে পারতো! উঃ। আর কি সুযোগ হবে কখনো?—

আমি বলি—'অদৃশ্য হওন'টা সম্বন্ধে সন্দেহ আমারও নেই, আর খানিক থাকলে মশাতেই অদৃশ্য করে ছাড়তো।

—থামো ছোট্‌কা, তুমিই আমার জীবনের শনি চিরকাল জানি যে—

আধসিদ্ধ বাদলের জ্বলন্ত দৃষ্টি দেখে ভরসা আর হয় না যে, আমার সম্বন্ধে কোনকালেও ওর মত বদলাবে।

—বেঁচে থাকার কোন মানে হয় ছোট্কা?—মানে আমাদের মতন লোকের?

আধখানা বিস্কুটে কামড় দিয়ে এই কূট দার্শনিক প্রশ্নটি বাদল আমার দিকে ছুঁড়ে দেয়। হঠাৎ বাদলের জীবনটা কেন অর্থহীন হয়ে গেল বুঝে উঠতে পারি না, ওকেই জিগ্যেস করি—কেন বল্তো? পকেটে অর্থ থাকলে নেহাৎ অর্থহীন লাগে না তো কই?

—ধেত্তারি তোমার পকেট। শুধু খাওয়া আর শোওয়া—কোন য়্যাড্ভেঞ্চার নেই—

ওঃ তাই। মনে মনে হেসে ফেলে বলি—তাই বা নেই কেন—এই যে—কাল ধূতি দু'জোড়া জোগাড় করা হ'ল—কম য়্যাডভেঞ্চার? খুড়ো-ভাইপোতে মিলে রাতের অন্ধকারে চোরের মতো চুপি চুপি—

—বাজে। আমার কিছু ভাল লাগে না।

বাদলের কথাটা শুনে মায়া হ'ল। সত্যি, নেহাৎ সঙ্গীহীন বেচারা, অথচ আমার মস্ত দোষ আছে—বাইরের ছেলেদের সঙ্গে বেশি মিশতে দিই না, কারণ আমার দাদা-বৌদির ধারণা বন্ধু-সংখ্যা বাড়লেই নাকি ছেলেরা সিগারেট খেতে শেখে। বোঝো ব্যাপার। তাঁরা তাঁদের আদরের মেয়েটিকে নিয়ে দিল্লী-সিমলে করে বেড়ান, পড়ার ছুতোয় ছেলেটি পড়েছে আমার ভাগে, কাজেই—ওর সুখ-দুঃখ তো আমাকেই দেখতে হবে? ভেবে-চিন্তে পকেটের ওজনটা কিঞ্চিৎ হ্রাস করে একগাদা গল্পের বই কিনে এনেছিলাম। এবং এই ভেবে আশ্বস্ত হলাম যে, আমার পাপের কিছু প্রায়শ্চিত্ত হ'ল।

হঠাৎ একদিন বৌদির 'তার' এসে হাজির—"স্টেশনে উপস্থিত থেকো, রওনা হচ্ছি—"

ছুটলাম—দেখি বৌদি আর বাবলি, এবং ছোটয় বড়য় এগারোটা সুটকেস।

ব্যাপার কি? না—দিল্লীতে অসহ্য গরম পড়ে গেছে—অথচ এ বছর সিমলে যাওয়ার ব্যবস্থা নেই। কাজেই প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসা ছাড়া উপায় কি?

বললাম—কিন্তু দাদা? তাঁরও তো তা'হলে বেজায় কষ্ট এবার?

বৌদি হি হি করে হেসে উঠলেন—কি যে বল ঠাকুরপো, পুরুষমানুষের আবার কষ্ট !

তা' হবে—পুরুষ মানুষের বোধ করি কষ্ট হওয়া আইন নয়। যাক, মোটের মাথায় বাব্‌লি আসায় আমি বাঁচলাম, বাদলের একটু সুরাহা হ'ল।

—কিন্তু সুটকেস্‌গুলো সব এনেছ কেন বলতো ? সমস্ত সংসারটাই এনেছ নাকি ? পূরুষমানুষের কি জিনিসের অভাবেও কষ্ট হওয়া আইন নয় ?

—বাঃ কি যে বল ? আমার তো মোটে তিনটে সুটকেস, বাকি আটটাই বাব্‌লির। সবগুলোই নাকি ওর 'ভীষণ দরকারি' —রাজ্যের বই কিনে বাড়ি বোঝাই করছে দিনরাত।

নির্ভাবনায় আছি—ভাবছি এইবার নিজের লেখাপত্তরে ভালো করে মন দেব। তাই কাগজ-কলম নিয়ে গুছিয়ে বসেছি—সহসা —বাব্‌লি আর বাদল এসে এমন একটা অদ্ভুত আবেদন করে বসলো যে আমার গল্পের পাত্রপাত্রী হোঁচট খেয়ে বসে পড়লো।

—একটা খরগোসের চামড়া জোগাড় করে দাও না ছোট্‌কা।

—খরগোসের চামড়া ? সে আবার কি জিনিস রে বাদলা ?

—খরগোসের ছাল গো—মানে—যেমন বাঘের ছাল, হরিণের চামড়া—মানে—আর কি খরগোসের মাংসটা থাকবে না, শুধু ওপরের খোসাটা।

মানে বুঝতে গিয়ে আরো অথই জলে পড়ে যাই। খরগোসের খোসা! কখনো শুনেছি বলে স্মরণ করতে পারি না।

বাব্লি অসহিষ্ণুভাবে বলে—তুমি বড্ডো দেরিতে বোঝ ছোট্কা। ধরো—কেউ যদি খরগোসের ছদ্মবেশ ধরতে চায়? কি করবে সে? একখানা ছাল না হ'লে চলে?

হাতের কলম হাতে রেখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকি, বুঝে উঠতে পারি না, বাঙ্লা ভাষা শুনছি না আর কিছু।

—ব্যাপারটা ভালো করে বুঝিয়ে দে দিকিনি আমায়, তোদের মাথার অবস্থা ভালো আছে তো? যে গরম পড়েছে—

—গরমে আমাদের মাথা গরম হয়ে গেছে ভাবছো? মোটেই না। শোনো তাহ'লে বলি—তোমার ঘড়িচোরকে খুঁজে বার করবো আমরা।

কয়েকদিন হ'তে কব্জি-ঘড়িটা পাচ্ছি না—কিন্তু চুরিই গেছে একেবারে—এখনো সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারিনি, কোথায় রেখেছি হয়তো।

কিন্তু এরা বলে কি?

—শোন্ বাদল, আদ্যোপান্ত খুলে বল্ আগে—তারপর খরগোসের খোসা অথবা কাঠবেড়ালীর আঁটি যা চাস্—

—তোমাকে আদ্যোপান্ত বোঝানো? হুঁঃ আমার কর্ম্ম নয়—তাছাড়া এ সব হ'ল প্রাইভেট ব্যাপার—বলে বাদল কলমটা তুলে চিবোতে সুরু করে।

অগত্যা বাব্লি। হাজার হোক মেয়ে-মানুষ তো—কতক্ষণ পেটে কথা রাখবে? ও যা বললে—তার সারমর্ম্ম এই যে—ঘড়ি

সম্বন্ধে ওরা নতুন ঠাকুরটাকে সন্দেহ করেছে—সন্দেহ কেন নিশ্চিতই, শুধু হাতে-নাতে ধরা একবার। কাজেই ছদ্মবেশের প্রয়োজন। আর এমন ছদ্মবেশ—যাতে কারুর মনে কোনো সন্দেহ না আসতে পারে। ধরো, গভীর রাত্রে ঠাকুর যখন খিল-বন্ধ ঘরে নির্ভাবনায় চোরাই মালটি বার করে দেখবে—সেই সময়, হঠাৎ খরগোসরূপী বাদলের চৌকির তলা থেকে বেরিয়ে তাকে ক্যাঁক্ করে চেপে ধরা—যাকে বলে বামাল সমেত গ্রেপ্তার।

সবই ঠিক। এখ্ন শুধু দরকার ওই খরগোসের ছাল।

ক্রমশঃই সন্দেহ গভীর হ'তে থাকে।

কিন্তু দু'টো ভাই-বোনেরই একসঙ্গে?

অমন পরিষ্কার মাথা ওদের? উঁচু ক্লাসের অঙ্ক কষে দিতে পারে বাদল জলের মতন—ঝট্ করে মাথাটা বিগড়ে যাবে?

—মানুষে কখনো জানোয়ারের ছদ্মবেশ নিতে পারে? ভালো করে ভেবে দেখ—বেশ সহজভাবে বোঝাতে চেষ্টা করি।

—মানুষে পারে না—বাব্লি বেশ আত্মস্থের সুরে বলে—কিন্তু ডিটেক্‌টিভ পারে তো? কী না পারে তারা? আর নাই যদি পারবে তা' হলে তো তারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমান হয়ে গেল? দরকার পড়লে অসাধ্য সাধনও করতে হয় যে ওদের!

—তাই বলে আস্ত একটা মানুষ খরগোসের খোসার ভেতর ঢুকবে? পারবে ঢুকতে?

করুণা আর অবজ্ঞার হাসি খেলে গেল বাব্লির মুখে—তুমি

দেখছি কিছুই জান না ছোট্‌কা। জানবে কোথ্‌থেকে? ভালো ভালো বই তো কখনো পড়লে না? কী ছিরির বই কিনে দিয়েছ দাদাকে—আহা, শুধু পয়সা নষ্ট!

লজ্জায় এতটুকু হয়ে যাই।

—খুব বাজে বুঝি বইগুলো? কই বাদল তো—

—দাদা আর কি বোঝে? তোমার হাতেই মানুষ তো? ...সে বইটা কি রে দাদা?

বাদলের রসনাকে ছুটি দিতে পারে একমাত্র বাব্‌লিই, কাজেই বাদল এতক্ষণ চুপ করেছিল. প্রশ্নবাণে বিদ্ধ হয়ে বললো—কোনটা? ও? সেইটা? "আম—আঁটির ভেঁপু—"

—ভালো নয় বইটা?—আশ্চর্য্য হয়ে বলি—অথচ দোকানে ওই বইটার বেশি প্রশংসা শুনলাম—

—শুনবে না কেন? বাজে জিনিষ গছাতে পারলে কে ছাড়ে? যেমন নামের ছিরি, তেমনি বইয়ের ছিরি—অথচ কত ভালো ভালো বই রয়েছে...আচ্ছা ছোট্‌কা "রহস্যের রক্তলীলা" পড়নি তুমি?

—কই না তো।

—"ভয়ঙ্করের তাণ্ডব নৃত্য?" "হত্যাস্রোতের মৃত্যু পাথার?" "যমরাজের ঝমঝমানি?"

—কই কিছুই তো পড়েছি বলে মনে পড়ছে না?—লজ্জায় আর মুখ তুলতে পারি না।

—"কুহেলিকা" সিরিজের কোনো বই-ই পড়নি বুঝি?

—উঁহু।

বিস্ময়ে গোল চোখ আরো গোল হয়ে ওঠে বাব্লির।

—"গৌরীশঙ্কর সিরিজের"? তাও না? কোনো বই-ই পড়নি?

—না তো। বড্ডো ভুল হয়ে গেছে দেখছি, দু'একটা জোগাড় করে দিস তো পড়ে দেখবো।

—জোগাড় আবার কি? ফুল্সেট্ই তো রয়েছে আমার। সাতটা স্যুটকেসে তা'হলে আছে কি? একটায় তো শুধু কাপড়-জামা। কিন্তু তুমি কি অদ্ভুত ছেলে ছোট্কা? এদিকে তো সারাদিনই লিখছো, পড়ছো। ডিটেক্টিভদের বিষয়ে তা'হলে দেখছি কোন জ্ঞান নেই তোমার। মিস্টার ব্লেককেও চেন না নিশ্চয়!

—মিস্টার ব্লেক? একটু যেন চিনি মনে হচ্ছে।

—তবে? সেই "সাতফুট লম্বা দীর্ঘনাসা ভদ্রলোক" খর্ব্বকায় চীনা বালকের ছদ্মবেশ ধরেন কি করে? কাফ্রি দস্যুদের দলপতির ছদ্মবেশ ধরে দেড় মাস তাদের সঙ্গে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালেন কি করে? দরকার পড়লে সবই করতে হয়—

—আর আমাদের অতুল ভাদুড়ী—বাদল এবার যেন সদ্য-খোলা সোডার বোতলের মতো ফুটে ওঠে—ছাগলের ছদ্মবেশে হত্যাকারীকে ধরে ফেলল না? আস্ত একটা গোয়েন্দা—ছাগলের ছদ্মবেশ ধরলে দোষ হয় না—আর আমি এইটুকু ছেলে, তাও রোগা হয়ে গেছি আজকাল—খরগোস হ'তে চাইলেই দোষ? ঠাকুরের একটি পোষা খরগোস আছে বলেই না—

—ওর পেটের মধ্যেই ঘড়িটা আছে কিনা কে জানে?

বাব্‌লি দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে নিজের মৌলিক সন্দেহের কথা প্রকাশ করে।

—কিন্তু সেটা যে জ্যান্ত—চেষ্টা করেও আমার অবিশ্বাসের সুরটা লুকোতে পারি না, ধরা পড়ে যাই।

—ওই তো ছোট্‌কা সবেতেই তোমার অবিশ্বাস—বাদল বলে ওঠে—নিজের চোখের মণি উপড়ে ফেলে কাঁচের চোখের মধ্যে পুরানো দলিল লুকিয়ে রাখার কথাও হয়তো বিশ্বাস করবে না তুমি? শহরের সমস্ত বড় লোকের গুপ্ত কাহিনীর দলিল তিরিশ বছর ধরে ওইভাবে লুকিয়ে রেখে একটা দস্যু শেষকালে কী কাণ্ডটাই না করলে—

—অন্ততঃ "মোহন সিরিজ"টাও যদি পড়ে রাখতে ছোট্‌কা!

বাব্‌লির সুরে গভীর হতাশ্বাস।

আমার ওপর ক্রমশঃই ভরসা হারিয়ে ফেলছে ওরা।

—ছোট হয়েই হয়েছে আমাদের মুস্কিল—বাদল সক্ষোভে মন্তব্য করে ওঠে—ডিটেকটিভ হ'তে হ'লে কত মাল-মশলা আর সাজ-সরঞ্জাম যে লাগে—ধরো তোমার ড্রেসিং টেবিলের ওপর যদি—অটোমেটিক ক্যামেরা ফিট্‌ করা থাকতো—ঘড়িটা নেবার সময়ই চোরের ফটো উঠে যেতো।

—কিম্বা পাপোশের নিচে একটা ইলেকট্রিক বেল্—

—তুই থাম্ বাব্‌লি, আমাদের বাঙালী বাড়িতে ওসব কোনো সুবিধেই নেই। একটা সায়ান্স ল্যাবরেটরি থাকলেও তো হোতো! এমন কি একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাসের পর্য্যন্ত অভাব।

আমার আদরের ভাই-পো-ভাইঝির ম্লান মুখচ্ছবি দেখে—

ভবিষ্যতে ক্যামেরা, পিস্তল, ল্যাবরেটরি, প্রাইভেট প্লেন, দূরবীন, গ্যাস মুখোস, প্রভৃতি ছোট-বড় অসংখ্য জিনিসের এবং বর্ত্তমানে—ওই খরগোসের চামড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসি।

ডিটেক্‌টিভের খুড়ো হয়ে এটুকু অসাধ্য সাধন করতে পারব না?

কিন্তু অদৃষ্ট এমনি মন্দ—মানে আমার নয়, বাদল আর বাব্‌লির—ঘড়িটা বেমালুম পাওয়া গেল। সেলফে বইয়ের থাকের পেছনে নিজেই রেখেছিলাম কোন সময়।

বাব্‌লি সক্ষোভে বলে—সত্যি যা বলেছিস দাদা, নেহাৎই বাজে বাড়িটা আমাদের, একেবারে রহস্যহীন। মেজে থেকে দেওয়াল পর্য্যন্ত আগাগোড়া ছোট্‌কার মগজের মতোই নীরেট। 'সুড়ঙ্গ পথ', 'পাতাল কক্ষ' বা 'গুপ্তগহ্বর' এমন কিছুই নেই যেখানে রহস্যের নাম গন্ধও আছে। তবু ঘড়িটা চুরি হয়ে অবধি একটু আহ্লাদ হচ্ছিল—

—আহ্লাদ?—চমকে উঠি আমি।

—আঃ ঘড়িটা তো আমরা উদ্ধার করতামই, মাঝে থেকে একটু এক্সপিরিয়েন্স হ'ত দাদার, বড় হ'য়ে তো গোয়েন্দাই হ'তে হবে ওকে।

—আর এক্সপিরিয়েন্স, সাতজন্মে একটা চুরিও হয় না বাড়িতে!—বাদল লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে।

কাটলো কয়েকদিন। ভাবছি—সম্পাদকের তাড়াটা একটু কমলেই ওদের একদিন সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবো। অ্যাড্‌-ভেঞ্চারাস্‌ কোনো ছবি আসুক কোনোখানে। ঘড়িটা খুঁজে পাওয়া

পর্য্যন্ত ভারী মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে আছে বেচারারা। দুটি ভাই-বোনে খালি 'ফুস্‌ফুস্‌ গুজগুজ' কথা, বড়দের দেখলেই চুপ করে যায়।

হয় তো বা আমাদের নিন্দেই করে।

খুচরো কাগজগুলো পাতার নম্বর মিলিয়ে গুছিয়ে রাখছি—হঠাৎ বৌদি এসে কাতরভাবে বললেন—ছোট্ ঠাকুরপো শুনেছ? ঠাকুর পালিয়েছে।

—তাই নাকি? কিছু নিয়েটিয়ে যায়নি তো?

—নিয়ে যাওয়ার কথা হচ্ছে না, এখন রান্না চড়াবে কে? এই গরমে তো আর রান্না করতে পারে না মানুষ?

বললাম—পাগল হয়েছ, তাই কখনো হয়? এবেলা পাঁউরুটি দিয়ে কাজ চালিয়ে দাও, ওবেলা বামুন ধরে আনবো অখন। কিন্তু ঠাকুরটা হঠাৎ গেল যে?

—কি জানি? কাল রাত্রেও তো বেশ কাজকর্ম্ম সেরে শুয়ে ছিলো—ভোরবেলা উঠে উনুনে আগুন দিয়ে পালিয়ে গেছে।

—উনুনে আগুন দিয়ে পালিয়েছে? রহস্য-ময় অন্তর্ধান বটে—দেখ দিকিন তোমার ছেলেমেয়েরা যদি এর থেকে কিছু সূত্রটুত্র আবিষ্কার করতে পারে।

বলতে না বলতে ছেলেমেয়ে এসে হাজির। যাকে সাধু ভাষায় বলা চলে—রুদ্ধকণ্ঠ, আরক্তমুখ, উৎসাহে মাথার চুল প্রায় খাড়া হয়ে উঠেছে।

—দেখলে ছোট্‌কা বলিনি আমি ?

—তুই থাম্‌ দাদা, আমি-ই আগে বলেছিলাম—

—ফন্দিটা কে বার করেছিল ?

—আর লক্ষণ দেখে সাব্যস্ত করেছিল কে ?

ওদের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ থামিয়ে জিগ্যেস করি, ব্যাপারটা কি ?

—বলিনি ঠাকুরটা চোর ? ওই যে "চাপা নাক, দৃঢ় চোয়াল, আর টালু মাথা"—সম্পূর্ণ অপরাধীর লক্ষণ ওটা।

—কিন্তু চুরিটা কি করলো ?

—কেন বাব্‌লির হার।

—বাব্‌লির হার ?...বৌদি শিউরে ওঠেন—চীৎকার করে ওঠেন —বাব্‌লির হার কোথায় পেলো সে ?

—রান্নাঘরের তাকে রেখে দিয়েছিলাম আমি।

—রান্নাঘরের তাকে হার রেখেছিলি বদমাইশ মেয়ে ? রাখবার আর জায়গা পাস্‌ নি ? খুলেছিলি কেন ? কখন খুলেছিলি ?

প্রহারোদ্যত মাতৃদেবীর কবল থেকে অনেক কষ্টে রক্ষা করি ওকে।

ঘটনাটা সংক্ষেপে এই—"চাপা নাক আর দৃঢ় চোয়ালের" হাতাহাতি প্রমাণ না পেয়ে ওদের কিছুতেই শান্তি হচ্ছিল না, অথচ ঠাকুরটা এমনি চালাক যে দিনের পর দিন দিব্যি রান্নাবান্না চালাচ্ছে—একটা আলু-পটল পর্য্যন্ত চুরি করে না। এদিকে বাব্‌লিদের দিল্লী যাবার দিন এগিয়ে আসচে।

কাজেই ওদের উর্ব্বর মস্তিষ্ক-যুগল কাজে লেগে যায়। রাত্রে চাকর রান্নাঘর ধোওয়া-মোছা করে শুয়ে পড়বার পর বাদল কৌশলে চাবিটা হস্তগত করে—এবং মাঝ রাত্রে দুই ভাইবোন

চুপি চুপি উঠে চোর শিকারের আশায় টোপ ফেলে রেখে যায়।

হিসেবের ভুল ওদের হয় নি।

দরজার কড়ায় লাগানো ভেস্‌লিনের ওপর ডিটেক্‌টিভ-লোশন আঙুলের ছাপ এবং ঘরের মেজেয় ছড়ানো পাউডারের ওপর বড় বড় পায়ের ছাপ পরিষ্কার ফুটে আছে—নেই শুধু চোর আর চোরাই মাল।

সমাপ্ত